সামাজিক বিজ্ঞান

২য় ভাগ

ভূগোল

অষ্টম শ্রেণী

শিক্ষক শিক্ষা নির্দেশালয়
এবং
রাজ্য শিক্ষা গবেষণা ও প্রশিক্ষণ পরিষদ
ওড়িশা, ভুবনেশ্বর

ওড়িশা প্রাথমিক শিক্ষাকার্যকম প্রাধিকরণ
ভুবনেশ্বর

ভূগোল
অষ্টম শ্রেণী

মাধ্যমিক শিক্ষা পরিষদ, ওড়িশা দ্বারা অষ্টম শ্রেণীর জন্যে প্রথম সংস্করণ প্রস্তুতি (২০১১) অনুমোদিত।
মাধ্যমিক শিক্ষা পরিষদ, কটক, ওড়িশা।

লেখক ও সমীক্ষক মণ্ডলী ঃ
প্রফেসার ডাঃ সচ্চিদানন্দ ত্রিপাঠী (সমীক্ষক)
ডঃ নিরঞ্জন দাশ
ডঃ সৌদামিনী রায়
শ্রী শৈলেশ চন্দ্র দাসগুপ্তা
শ্রী প্রভাকর প্রধান

পরিবর্তিত সংস্করণের প্রস্তুতি (২০১৬) ২০১৭ - ২০১৮
শিক্ষক শিক্ষা নির্দেশালয় এবং রাজ্য শিক্ষা গবেষণা ও প্রশিক্ষণ পরিষদ, ওড়িশা, ভুবনেশ্বর

সমীক্ষক মণ্ডলী ঃ
শ্রী প্রদীপ কুমার মহাপাত্র
শ্রী প্রভাকর প্রধান
ডঃ সুধাংশু কুমার মহান্তি
ডঃ প্রফুল্ল কুমার কর

সংযোজনা ঃ
ডঃ সবিতা সাহু

সংযোজনা ঃ
ডঃ তিলোত্তমা সেনাপতি

প্রকাশক ঃ
বিদ্যালয় ও গণশিক্ষা বিভাগ, ওড়িশা সরকার

মুদ্রণ ঃ
পাঠ্যপুস্তক উৎপাদন ও বিক্রয়, ভুবনেশ্বর

মুদ্রণ বর্ষ ঃ ২০২২

জগৎ মাতার শ্রীচরণে অদ্যাবধি যা যা নিবেদন করেছি, তার মধ্যে মৌলিক শিক্ষা, সব থেকে অধিক ক্রান্তিকারী ও মহত্ত্বপুর্ণ মনে হচ্ছে। এর থেকে অধিক মহত্ত্বপূর্ণ ও মূল্যবান উপহার আমি যে জগতের সম্মুখে উপস্থিাপিত করতে পারবো; তা আমার প্রত্যয় হচ্ছে না। এতে রয়েছে আমার সমগ্র রচনাত্মক কার্য্যক্রমকে প্রয়োগ করার চাবিকাঠি। যে নূতন পৃথিবীর জন্যে আমি ছটফট করছি। তা এর থেকেই উদ্ভব হতে পারে এটাই আমার অন্তিম অভিলাষ বললে চলে।

মহাত্মা গান্ধী

ভারতের সংবিধান

প্রাক্ কথন ঃ

আমরা ভারতবাসী, ভারতকে এক সার্বভৌম, সমাজবাদী, ধর্ম নিরপেক্ষ গণতান্ত্রিক, সাধারণতন্ত্র রূপে গঠন করার দৃঢ় সংকল্প নিয়ে ও এর নাগরিকদের জন্য।

- সামাজিক , অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক ন্যায় ;
- চিন্তা, অভিব্যাক্তি, প্রত্যয়, ধর্মীয় বিশ্বা এবং উপাসনার স্বতন্ত্রতা;
- স্থিতি ও সুবিধা সুযোগের সমতার সুরক্ষা প্রদান করা তথা;
- ব্যক্তি মর্য্যদা এবং রাষ্ট্রের ঐক্য ও সংহতি নিশ্চিত করে তাদের মধ্যে ভ্রাতৃভাব উৎসাহিত করার লক্ষ্যে

আজ, ১৯৪৯ সালের ২৬শে নভেম্বর আমাদের সংবিধান প্রণয়ন সভায় এতদ্বারা এই সংবিধান গ্রহণ ও প্রণয়ন এবং আমরা নিজেদের অর্পণ করছি।

চতুর্থ অধ্যায় (ক)
৫১ (ক) ধারা ঃ মৌলিক কর্তব্য

ভারতের প্রত্যেক নাগরিকের নিম্নলিখিত কর্তব্য ঃ

ক) সংবিধান মেনে চলা এবং এর আদর্শ ও অনুষ্ঠান গুলি এবং জাতীয় পতাকা ও জাতীয় সঙ্গীতকে সম্মান প্রদর্শন করা;

খ) যে সব মহান আদর্শ আমাদের জাতীয় সংগ্রামকে অনুপ্রাণিত করেছিল তা' স্মরণ ও অনুসরণ করা;

গ) ভারতের সার্বভৌম, একতা ও সংহতির সুরক্ষা করা ;

ঘ) দেশের প্রতিরক্ষা করা ও প্রয়োজনে জাতীয় সেবা প্রদান করা ;

ঙ) ধর্মগত, ভাষাগত, এবং আঞ্চলিক কিম্বা গোষ্টিগত ভিন্নতা অতিক্রম করে ভারতের জনসাধারণের মধ্যে ঐক্য ও ভ্রাতৃভাব প্রতিষ্ঠা করা এবং নারী জাতির প্রতি অমর্যাদা সূচক ব্যবহার পরিত্যাগ করা;

চ) আমাদের সংস্কৃতির মূল্যবান ঐতিহ্যকে সম্মান প্রদর্শন ও সংরক্ষণ করা;

ছ) অরণ্য, হ্রদ, নদী বণ্যপ্রাণী সমেত প্রাকৃতিক পরিবেশের সুরক্ষা ও উন্নতি করা এবং জীব জগতের প্রতি অনুকম্পা প্রদর্শন করা ;

জ) বৈজ্ঞানিক মনোভাব ও মানববাদ এবং অনুসন্ধিসা ও সংস্কার মনোভাব পোষণ করা;

ঝ) জনসাধারণের সম্পত্তির সুরক্ষা করা ও হিংসা ত্যাগ করা;

ঞ) ব্যক্তিগত ও সমষ্টিগত কার্যাবলির প্রত্যেক ক্ষেত্রে উৎকর্ষ সাধন করা, যার দ্বারা আমাদের দেশ প্রচেষ্টা ও কৃতিত্বের উচ্চতর সোপানে অবিরত উন্নতি করতে পারবে।

ট) পিতা, মাতা বা অভিভাবক, তাদের ৬ থেকে ১৪ বছর বয়সের সন্তান বা পালিত সন্তানের শিক্ষালাভের সুযোগ করে দেওয়া।

মুখবন্ধ

প্রথম সংস্করণ

মানুষ সামাজিক জীব। সমাজে তার জন্ম, বেড়ে ওঠা ও মৃত্যু। সেই সমাজের বিষয়ে বিশেষ জ্ঞানকে ''সামাজিক বিজ্ঞান'' বলা হয়। অষ্টম শ্রেণীর জন্যে উদ্দিষ্ট এই ''সামাজিক বিজ্ঞান'' ইতিহাস, রাজনীতি ও ভূগোলের এক সংযুক্ত পাঠ্য পুস্তক। এই পুস্তক জাতীয় শিক্ষা গবেষণা ও প্রশিক্ষণ পরিষদ, নূতন দিল্লী তথা আমাদের রাজ্যের SCF - 2007 এর নমুনা পাঠ্যক্রমের খসড়ার উপরে আধারিত।

ভূগোলে একজন শিক্ষার্থী এই বিশাল পৃথিবীর গঠন, পরিপার্শ্ব, জলবায়ু ও প্রাকৃতিক সম্পদের বিষয়ে জ্ঞান লাভ করে। এদিকে দৃষ্টি রেখে এই পাঠ্য পুস্তকটি পূর্বাপেক্ষা এক অভিনব রূপে প্রস্তুত করা হয়েছে। এতে প্রথম বার 'তোমার জন্য অনুশীলন' ও 'জ্ঞাতব্য বিষয়' দেওয়ার চেষ্টা করা হয়েছে। একজন শিক্ষার্থী মনযোগ দিয়ে পাঠ্য পুস্তকটির সব বিভাগ অধ্যয়ন করলে নিশ্চয় সামাজিক বিজ্ঞান বিশেষতঃ ভূগোলের বাস্তব মূল্যবোধ উপলব্ধি করতে পারবে বলে আশা ও বিশ্বাস।

বইটির পাণ্ডুলিপি রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে আমন্ত্রিত অভিজ্ঞ শিক্ষক-শিক্ষিকাদের উদ্দেশ্যে আয়োজিত এক কর্মাশালায় নিরীক্ষিত, আলোচিত ও সমীক্ষিত হওয়ার পরে তাঁদের বিজ্ঞ প্রস্তাব যথা সম্ভব গ্রহণ করা হয়েছে।

পরিশেষে এই শ্রম সাপেক্ষ সম্পাদনায় সম্পৃক্ত শিক্ষক-শিক্ষিকা, কর্মচারী, অধিকারী, লেখক মণ্ডলী, সংযোজক, সমীক্ষক ও মুদ্রাকরকে পরিষদ আন্তরিক ধন্যবাদ জানাচ্ছে। ত্রুটিহীন সম্পাদনার জন্য অদম্য চেষ্টা সত্ত্বেও ত্রুটি বিচ্যুতি এড়ানো যায় নি। আশা ও বিশ্বাস অনিচ্ছাকৃত ত্রুটি বিচ্যুতি কর্তৃপক্ষের গোচরে এলে পরবর্তী সংস্করণে সংশোধন করা হবে। ধন্যবাদ।

সভাপতি
মাধ্যমিক শিক্ষা পরিষদ
ওড়িশা

মুখবন্ধ

পরিবর্তিত সংস্করণ

বিদ্যালয় ও গণ শিক্ষা বিভাগ, ওড়িশা সরকারের নির্দেশে, শিক্ষক শিক্ষা নির্দেশালয় এবং রাজ্য শিক্ষা গবেষণা ও প্রশিক্ষণ পরিষদ, ওড়িশা, মূল সামাজিক বিজ্ঞান পুস্তকের একটি নূতন পরিবর্তিত সংস্করণ প্রস্তুত করেছেন। প্রয়োজনে প্রদত্ত ভাষাগত, তথ্যগত ও প্রশেগত বিষয়ে অল্প পরিবর্তন করা হয়েছে। পুস্তকটি অধিক সময় উপযোগী করবার জন্যে সমীক্ষক মণ্ডলী চেষ্টা করেছেন। অল্প সময়ের মধ্যে এই পরিবর্তিত সংস্করণটি প্রস্তুত করা হয়েছে।

ত্রুটিহীন সমীক্ষার জন্য ও শিক্ষার্থীদের আবশ্যকতা অনুযায়ী পুস্তকটি আরও আকর্ষণীয় করার চেষ্টা করা হয়েছে।

পাঠ্যপুস্তকটির পরিবর্তিত সংস্করণ অধিক উপযোগী হলে সমীক্ষক মণ্ডলী ও সংযোজকের পরিশ্রম সার্থক হবে।

সমীক্ষক মণ্ডলী

সূচীপত্র

ভূগোল

অধ্যায়	প্রসঙ্গ	পৃষ্ঠা
প্রথম	সম্পদ	১ - ৬
	সম্পদের প্রকার ভেদ, সম্পদের সংরক্ষণ ও বিকাশ	
দ্বিতীয়	ভূসম্পদ, জল সম্পদ, প্রাকৃতিক উদ্ভিদ ও বন্যপ্রাণী, খনিজ ও শক্তি সম্পদ	৭ - ৩৬
	ভূ-সম্পদের বিতরণ, সম্পদের প্রকার ভেদ, ভূমি ব্যবহার ভূ-সম্পদের সংরক্ষণ, চূর্ণীভবন প্রক্রিয়া, মৃত্তিকা গঠনের নিয়ামক, মৃত্তিকার শ্রেণী বিভাগ, ওড়িশায় মৃত্তিকার বিতরণ ও সংরক্ষণ, জলসম্পদ, স্থল ভাগে জলের বন্টন, জলের ব্যবহার ও জলাভাব, জল সম্পদের সংরক্ষণ, ব্যবহার বিতরণ ও শ্রেণী বিভাগ, প্রাকৃতিক উদ্ভিদের সংরক্ষণ, বন্য জন্তু সংরক্ষণ, খনিজ দ্রব্যের প্রকার ভেদ, খনিজ উত্তোলন খনিজ দ্রব্যের বিতরণ ও সংরক্ষণ, শক্তি সম্পদের শ্রেণী বিভাগ, প্রচলিত এবং অপ্রচলিত শক্তি, শক্তি সংরক্ষন।	

অধ্যায়	প্রসঙ্গ	পৃষ্ঠা
তৃতীয়	কৃষি	৩৭ - ৫২
	কৃষি কার্যের অনুকূল অবস্থা, কৃষির প্রকারভেদ, প্রধান কৃষিজাত দ্রব্য, কৃষির উন্নয়ণ — ভারতের কৃষি।	
চতুর্থ	শিল্প	৫৩ - ৬৪
	শিল্পর শ্রেণী বিন্যাস, শিল্প প্রতিষ্ঠার প্রভাবিত করার কারণ, শিল্প দুর্ঘটনা, প্রধান শিল্প সংস্থাগুলির বিতরণ, প্রযুক্তি বিদ্যা, শিল্প অবস্থানের প্রেক্ষিতে বেঙ্গালুরুর বিশেষত্ব, সিলিকন্ ভ্যালি (উপত্যকা)র বিশেষত্ব।	
পঞ্চম	মানব সম্পদ	৬৫ - ৭১
	মানব সম্পদ, জনসংখ্যার ঘনত্বকে প্রভাবিত করার কারণ, জনসংখ্যা পরিবর্তনের ধারা, জনসংখ্যার গঠন, জনসংখ্যা পিরামিড ও জনসংখ্যার তথ্য।	

——oo——

প্রথম অধ্যায়

সম্পদ (Resources)

মায়ের ঘর গোছাবার সময় মেয়ে মনা ও ছেলে অংশু সাহায্য করছিল। মান অংশুকে বলল দ্যাখ্ কাপড় চোপড় বাসন, ধান-চাল, চিরুনী, চেয়ার, টেবিল বই-খাতা প্রভৃতি সবকিছু আমাদের কাজে লাগছে। সেজন্য এগুলো গুরুত্বপূর্ণ। মা বললেন এগুলোই সম্পদ। মা সম্পদ কি? অংশু জিজ্ঞেস করল। মা উত্তর দিলেন বিভিন্ন আবশ্যকতা পূরণ করার জন্যে আমাদের ব্যবহৃত জিনিস হচ্ছে সম্পদ। তুই তোর চারপাশে লক্ষ করলে বিভিন্ন সম্পদ দেখতে পাবি। তৃষ্ণা মেটানোরবার জন্য পানিয় জল, বাড়ি আলোকিত করার জন্য বিদ্যুৎ, স্কুল যাওয়ার জন্য সাইকেল, জ্ঞান আহরণের জন্য বই ইত্যাদি সব কিছুই সম্পদ। আজ পাঁচমেশালি তরকারী তৈরী করেছি, সেই সবুজ শাক সবজি সম্পদ।

জল, বিদ্যুৎ, সাইকেল, সাকসবজি ও পাঠ্যবইয়ের মধ্যে একপ্রকার মিল রয়েছে এগুলো তোমরা ব্যবহার করছো, সেজন্য এগুলোর উপযোগিতা উপকারিতা আছে। সুতরাং উপযোগিতা এবং প্রয়োজনীয়তা কোনো দ্রব্য বা পদার্থকে সম্পদে পরিণত করে।

তা হলে কোনো পদার্থ কিভাবে সম্পদে পরিণত হয়? অংশু জানতে চাইল। মা বললেন তোমরা জেনে রাখো, কোনো পদার্থ তখনই সম্পদে পরিণত হয় যখন এর কিছু মূল্য থাকে পদার্থের ব্যবহার এবং উপযোগিতাই একে মূল্যবান করে তোলে। প্রত্যেক সম্পদের কিছু না কিছু মূল্য থাকে'' — মা বললেন।

তোমার কাজঃ

বাড়িতে ও স্কুলে ব্যবহৃত পাঁচটি করে সম্পদের তালিকা তৈরী কর।

কিছু পদার্থের আর্থিক মূল্য আছে। অন্য কিছু পদার্থের আর্থিক মূল্য নেই। উদাহরণ স্বরূপ ঃ ধাতব পদার্থের আর্থিক মূল্য আছে। কিন্তু সৌন্দর্য্যময় ভূমিরূপের কোনো মূল্য থাকে না। মায়ের স্নেহ, মমতা ছাড়া ছোট শিশু বাঁচতে পারে না। সুতরাং এ এক অমূল্য সম্পদ। প্রত্যেক ব্যক্তির উত্তম চরিত্র এই রকম এক সম্পদের উদাহরণ। তাই উভয় প্রকার সম্পদেরই গুরুত্ব আছে এবং উভয়েই মানুষের প্রয়োজন পুরণ করে। কিছু সম্পদ সময়ের অগ্রগতির ফলে আর্থিক ভাবে মূল্যবান হয়ে যায়। যথাঃ ঠাকুমার টোটকার এখন কোনো বাজার মূল্য নেই। তবে এগুলো যদি পেটেন্ট যুক্ত হয় এবং কোনো মেডিকাল ফার্মের দ্বারা বিক্রি করা যায় তবে এগুলো আর্থিক মূল্যযুক্ত হতে পারে।

পেটেন্ট ঃ কোনো উদ্ভাবনের ওপর পূর্ণ অধিকার নেওয়াকে পেটেন্ট বলা হয়।

সময় ও প্রযুক্তি বিদ্যা যেকোনো দ্রব্যকে সম্পদে পরিণত করতে পারে। এদুটিই মানুষের প্রয়োজন সম্পর্কিত। মানুষ নিজেই গুরুত্বপূর্ণ সম্পদ, কারণ তাঁদের জ্ঞান, পরিকল্পনা, আবিষ্কার ও উদ্ভাবন, নূতন সম্পদ সৃষ্টির সহায়ক হয়। প্রত্যেক আবিষ্কার ও উদ্ভাবন অনেক কিছুর কারণে হয়ে থাকে।

উদাহরণ স্বরূপ ঃ আগুনের আবিষ্কারসহ রান্নাবান্না ও অন্যান্য প্রক্রিয়ার আবিষ্কার হলো সেই ভাবে চাকার উদ্ভাবন কালক্রমে পরিবহনের অত্যাধুনিক রূপ বিকাশের সহায়ক হলো।

প্রযুক্তি বিদ্যা ঃ সদ্যোজাত জ্ঞান কৌশল দ্বারা কাজকর্ম বা জিনিস প্রস্তুত করাকে বোঝায়।

তোমার কাজ ঃ

মা'য়ের প্রদত্ত তালিকায় কি কি পদার্থের বাজার মূল্য এখনও নেই দেখাও।

সূতীর কাপড়
লোহা পাথর
মেধা শক্তি
ঔষধীয় বৃক্ষ
চিকিৎসা বিদ্যা
গচ্ছিত কয়লা
সুন্দর প্রাকৃতিক দৃশ্য
কৃষি জমি
নির্ম্মল পরিবেশ
প্রাচীন জনমত
স্বাস্থ্যকর জলবায়ু
সুমধুর কণ্ঠস্বর
ঠাকুমার টোটকা
পরিবারের লোকের স্নেহ ভালবাসা

সম্পদের বিভিন্ন প্রকার ঃ

সাধারণ ভাবে সমস্ত সম্পদকে প্রাকৃতিক মনুষ্যকৃত ও মানব শ্রেণীভুক্ত করা যেতে পারে। প্রাকৃতিক সম্পদ।

প্রাকৃতিক পরিবেশ থেকে পাওয়া এবং প্রয়োজনে সামান্য পরিবর্ত্তন করে ব্যবহার উপযোগী করে নেওয়ার জন্য বাতাস, সূর্যরশ্মি, নদী ও হ্রদের জল, মৃত্তিকা, খনিজ পদার্থ প্রভৃতি প্রাকৃতিক সম্পদ। এদের মধ্যে প্রকৃতির দান স্বরূপ তথা অনায়াসে ব্যবহার উপযোগী রসদ পাই। এছাড়া অন্য আর কিছু প্রাকৃতিক সম্পদ আছে যা ব্যবহারের উপযোগী করে তোলার জন্য বিভিন্ন প্রকার যন্ত্রপাতি ও প্রযুক্তি বিদ্যার আবশ্যক হয়।

প্রাকৃতিক সম্পদকে উন্নতির বিকাশ ও ব্যবহার, উৎপত্তি, গচ্ছিত স্থিতির পরিমাণ এবং বন্টন ব্যবস্থার দৃষ্টিতে বিভিন্ন শ্রেণীতে বিভক্ত করা যেতে পারে।

বিকাশ, তথা ব্যবহারের দৃষ্টিতে সম্পদকে দু ভাগে বিভক্ত করা হয়। যথাঃ প্রকৃত সম্পদ ও প্রচ্ছন্ন সম্পদ।

যে সম্পদের পরিমাণ ও মান জানা যায়, সেগুলো হল প্রকৃত সম্পদ। আমরা এখন এই সম্পদগুলো ব্যবহার করছি। সে জন্যে এদের বিকশিত সম্পদও বলা হয়। ছোটনাগপুরের মালভূমি অঞ্চলস্থ ধাতব খনিজ দ্রব্য, তালচের অঞ্চলের কয়লা, উপকূলবর্তী সমতল ভূমির মৃত্তিকা ইত্যাদি প্রকৃত সম্পদের অন্তর্ভুক্ত।

যে সম্পদের সঠিক পরিমাণ ও মান এখনও অজানা এবং এখনও অব্যবহৃত সেগুলি হল প্রচ্ছন্ন সম্পদ। ভবিষ্যতে এর ব্যবহার হতে পারে। এখনো উপলব্ধ প্রযুক্তি বিদ্যার দ্বারা এসব সম্পদ ব্যবহারের উপযোগী করা সম্ভব হয়নি। উদাহরণ স্বরূপ ঃ লাদাখে থাকা ইউরেনিয়াম

ধাতু এক প্রচ্ছন্ন সম্পদ। ভবিষ্যতে ব্যবহার করা যেতে পারে। তেমনি সমুদ্রের জলে মিশে থাকা হাজার হাজার টন সোনা রূপা ইত্যাদি মূল্যবান ধাতু পৃথক করার মতো উপযোগী জ্ঞান কৌশল আয়ত্ব হয়নি, তাই এগুলো প্রছন্ন সম্পদ শ্রেণীভুক্ত । ঝোড়ো হাওয়া ২০০ বছর আগে 'প্রচ্ছন্ন সম্পদ' ছিল। বর্তমানে সেটা প্রকৃত সম্পদে পরিণত হয়েছে।

বায়ুকলের দ্বারা শক্তি উৎপাদনে 'নেদারল্যান্ড' এক অগ্রণী দেশ। আমাদের দেশে গুজরাট উপকূলে ও তামিলনাড়ুর নাগরকোয়েলে বায়ুকলের সাহায্যে বিদ্যুৎ উৎপাদন করা হচ্ছে।

উৎপাদনের ক্ষেত্রে সম্পদকে অজৈব ও জৈব শ্রেণীভুক্ত করা যেতে পারে। অজৈব সম্পদ সজীব। শিলা পাথর মৃত্তিকা, খনিজ পদার্থ, জল, বায়ু প্রভৃতি নির্জীব উপাদান অজৈব সম্পদ শ্রেণীভুক্ত। কিন্তু সমস্ত প্রাণী ও উদ্ভিদ বায়ুকল জৈব সম্পদ অন্তর্গত। (সমস্ত প্রাকৃতিক সম্পদকে পূরণের দিক দিয়ে সাধারণতঃ দুভাগে বিভক্ত করা যেতে পারে যথাঃ নবীকরণ যোগ্য এবং নবীকরণ অযোগ্য।

নবীকরণ যোগ্য সম্পদকে বারবার ব্যবহার করলেও তা পুনর্বার পূরণ হয়ে যায়। এগুলোর মধ্যে কিছু অফুরন্ত এবং মানুষের কার্য্যকলাপের দ্বারা প্রভাবিত হয় না। সৌরশক্তি বায়ুশক্তি এর উদাহরণ। তবে জল, মাটি, জঙ্গল প্রভৃতি প্রাকৃতিক সম্পদ অপচয়ের ফলে ক্রমশঃ হ্রাস পাচ্ছে। জল অবশেষে নবীকরণযোগ্য সম্পদ বলে মনে হয়। কিন্তু পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্তে জলস্তর হ্রাস পাওয়া তথা উৎসমুখ শুকিয়ে যাওয়ার ফলে আগামী দিনে প্রাণী জগৎ ক্ষতিগ্রস্ত হবে কিনা তা ভাবতে হবে।

নবীকরণ অযোগ্য সম্পদের ভাণ্ডার সিমীত। ব্যবহারের ফলে সম্পদের পরিমাণ হ্রাস পেলে বা শেষ হয়ে গেলে, পুনর্বার পূরণের জন্য হাজার হাজার বছর লেগে যায়। মানুষের আয়ুর তুলনায় পরিপূরণের সময় অত্যন্ত বেশী হওয়ার জন্য এদেরকে নবীকরণ অযোগ্য সম্পদ বলা হয়। যেমন কয়লা, পেট্রোলিয়াম, গ্যাস ইত্যাদি।

বন্টনের সুবিধার জন্য সম্পদকে দুভাগে ভাগ করা যেতে পারে। সর্বব্যাপী ও স্থানীয়। কিছু সম্পদ ভূপৃষ্ঠের সবজায়গায় পাওয়া যায়। সেই জন্যে এগুলোকে সর্বব্যাপী সম্পদ বলা হয়। উদাহরণ স্বরূপ আমাদের শ্বাসক্রিয়ার সময় আমাদের অজান্তে অনায়াসে এই সর্বব্যাপী. বাতাস আমাদের শরীরে ঢুকে যায়। অধিকাংশ সম্পদ ভূপৃষ্ঠের নির্দ্দিষ্ট স্থানেই পাওয়া যায়। যথা লোহা, তামা, সোনা, রূপো প্রভৃতি খনিজ পদার্থগুলো নির্দিষ্ট স্থানে পাওয়া যায় বলে এগুলোকে স্থানীয় সম্পদ বলা হয়।

প্রাকৃতিক সম্পদের বিতরণ, ভূমিরূপ, জলবায়ু এবং সমুদ্রপত্তনের উচ্চতার মতো বিভিন্ন ভৌতিক কারণের উপর নির্ভয় করে। বিভিন্ন স্থানের অসামাঞ্জস্যতার কারণেই ভূপৃষ্ঠের সম্পদের অধিষ্টান প্রভেদ দেখা দেয়।

মনুষ্যকুত সম্পদ ঃ

কিছু প্রাকৃতিক সম্পদ আছে যা প্রত্যক্ষ ভাবে ব্যবহার করা সম্ভব নয়। এগুলোকে

প্রয়োজনুসারে রুপায়ন করেই সম্পদ রূপে কাজে লাগানো হয়। মানুষ লোহা পাথর থেকে লোহা সম্পদে রূপান্তরিত করেছে। প্রাকৃতিক সম্পদ ব্যবহার করেই মানুষ ঘরবাড়ি, সেতু রাস্তাঘাট, যন্ত্রঘাট, যন্ত্রপাতি, যানবাহন ইত্যাদি তৈরী করেছে। সুতরাং এগুলো মনুষ্য সৃষ্ট সম্পদ। এমনকি প্রযুক্তি বিদ্যাও মনুষ্যসৃষ্ট সম্পদ মালা বলল, কাজেই এখন আমরা বলতে পারি লোকেরাই প্রাকৃতিক পদার্থ ব্যাবহার করে মনুষ্যসৃষ্ট সম্পদ প্রস্তুত করে। অংশু সায় দিয়ে হ্যাঁ বললো।

তোমার কাজ ঃ

তোমাদের চারপাশে থাকা পাঁচটা মনুষ্যকৃত সম্পদের নাম লেখ।

মানব সম্পদ ঃ

মানুষের কাছে জ্ঞান, দক্ষতা ও কারিগরী কৌশল থাকলে প্রকৃতিকে উপযোগী করে নতুন নতুন সম্পদ সৃষ্টি করতে পারে। এই জন্যে মানুষ এক স্বতন্ত্র সম্পদ শ্রেণীভুক্ত। একেই বলে মানব সম্পদ। উপযুক্ত শিক্ষা ও স্বাস্থ্যই মানুষকে মূল্যবান সম্বন্ধে পরিণত করে। মানুষের দক্ষতার অভিবৃদ্ধি ঘটিয়ে নতুন সম্পদ সৃষ্টি করাকে মানব সম্পদের বিকাশ বলা হয়।

তুমি জানো কি? ঃ

মানব সম্পদ বললে জনসংখ্যা এবং শারিরীক ও মানসিক দক্ষতা বোঝায়। মানুষকে সম্পদ রূপে গ্রহণ করার ভিন্ন ভিন্ন মত আছে। তবে ভৌতিক সম্পদকে মূল্যবান সম্পদে রূপান্তরিত করতে মানব দক্ষতার ভূমিকা অনস্বীকার্য্য।

পড়ো এবং চিন্তা কর ঃ

মানুষ পরস্পরের ওপর নির্ভরশীল। কৃষক সবার জন্যে খাদ্যের যোগান দেয়। বিজ্ঞানীরা বিভিন্ন কৃষি সমস্যার সমাধান করে দেওয়ায় কৃষির উৎপাদন বাড়ে। ফলে দুর্ভিক্ষ জনিত শস্যহানি থেকে রক্ষা পাওয়া যায়।

সম্পদ সংরক্ষণ (Resoure Conservation)ঃ

মানা এক অদ্ভুত স্বপ্ন দেখল। পৃথিবীর সব জল শুকিয়ে গেছে এবং গাছ কাটা হয়ে গেছে। কোথাও একটু ছায়া নেই কিম্বা খাদ্য পানীয় কিছু নেই। লোকেরা খুব দুর্দ্দশায় কাটাচ্ছে। খাদ্য ও ছায়ার জন্যে চারিদিকে হাহাকার হচ্ছে লোকেরা এদিক ওদিক দৌড়োদৌড়ি করছে। মানা মাকে স্বপ্নের কথা বলে বলল 'এটা কি সম্ভব?'

মা উত্তর ছিলেন হ্যাঁ এটা সম্ভব, আমরা যদি যত্নবান না হই, তবে নবীকরণ যোগ্য সম্পদ ও দুস্প্রাপ্য হয়ে যাবে এবং নবীকরণ অযোগ্য সম্পদ নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে। অংশু বলল আমরা তাহলে কি করবো? মা উত্তর দিলেন অনেক কিছু করতে পারব।

ধারনে বিকাশ ঃ

সম্পদের উপযুক্ত ব্যবহারের দ্বারা বর্ত্তমানের আবশ্যকতা পূরণ করা সহ পরবর্ত্তী প্রজন্মের যাতে সম্পদের অভাব না হয়, তার প্রতি যত্নবান হওয়াকে ধারণীয় বিকাশ বলা হয়।

সম্পদের সযত্ন বিনিয়োগ এবং নবীকরণের জন্য যথেষ্ট সময় দেওয়াকে সম্পদ সংরক্ষণ বলা হয়। সম্পদ বিনিয়োগ করার প্রয়োজনীয়তা এবং আগামী প্রজন্মের জন্য সংরক্ষণ করার মধ্যে ভারসাম্য বজয় রাখাকে ধারণের বিকাশ বলা হয়। সম্পদ সংরক্ষণ বিভিন্ন উপায়ে করা যেতে পারে।

১) ব্যবহারে হ্রাস করা (২) পুনঃ চক্রীকরণ, ৩) পুনঃ ব্যবহারের মাধ্যমে আমরা সবাই সম্পদ সংরক্ষণ করতে সহযোগ করতে পারবো। আমাদের প্রত্যেকের জীবন পরস্পরের সঙ্গে যুক্ত থাকায় এর যথেষ্ট গুরুত্ব রয়েছে।

সন্ধ্যায় মানা ও অংশু বন্ধুদের সঙ্গে মিশে পুরোনো কাপড়ের ব্যাগ, কাগজের ঠোঙা ও বাঁশের কাঠি দিয়ে ডালা তৈরী করল।

আমাদের প্রতিবেশীদের এর থেকে কিছু কিছু দেব। মানা বলল। আমীর বলল যাইহোক এর উদ্দেশ্য মহৎ।

আমাদের সম্পদের সুরক্ষা ও পৃথিবীকে সজীব রাখতে এটি উদ্দিষ্ট।

মেরী বলল আমি এবার থেকে সতর্ক ভাবে কাগজের ব্যাবহার করছি কাগজ তৈরী করতে অনেক গাছ কাটা যাচ্ছে।

বাড়িতে বিদ্যুৎ শক্তির অপচয় বন্ধ করা প্রয়োজন। কারণ জল ও কয়লা থেকে বিদ্যুৎ উৎপাদন হয়। অংশু বলল।

আশা বলল বাড়িতে জল নষ্ট করতে দেব না। প্রতিবিন্দু জলই মূল্যবান।

আমরা সবাই মিলেমিশে করলে বিরাট পরিবর্ত্তন সম্ভব। ছেলেরা একসঙ্গে বলে উঠল।

ধারণ বিকাশের কয়েকটি বিশেষতঃ

- ❖ দুনিয়ার সমস্ত প্রাণীর যত্ন ও সম্মানকরব।
- ❖ মানুষের জীবনে উন্নতি ঘটানো
- ❖ পৃথিবীর সামর্থ ও বিধিধতার সংরক্ষণ।
- ❖ প্রাকৃতিক সম্পদের অবক্ষয় হ্রাস করা।
- ❖ পরিবেশের প্রতি ব্যাক্তিগত ভাবধারা ও ব্যবহারে পরিবর্ত্তন আনা।
- ❖ বিভিন্ন অঞ্চলবাসীকে তাঁদের পরিবেশের ব্যাপারে যত্নবান হতে সচেতন করা।

মানা ও অংশুর বন্ধুরা এরকম কিছু কাজ করলো। তোমরা সম্পদ সংরক্ষনে কি পদক্ষেপ নেবে? আমাদের পৃথিবীর সবার ভবিষ্যত প্রকৃতির দেওয়া জীবন রক্ষাকারী উপাদানের সুপরিচালনা ও রক্ষনাবেক্ষন সহ সংযুক্ত সুতরাং প্রতিটি নবীকরণ সম্পদের ধারণীয় ব্যবহার। জৈব বিবিধতার সংরক্ষণ। প্রাকৃতিক পরিবেশের অতি কম্ বিনষ্ট করা এর প্রতি নজর দিয়ে উপযুক্ত ভাবে চিন্তা করবো।

প্রশ্ন ঃ

১। নিম্নলিখিত প্রশ্নের উত্তর দাও ঃ

ক) ভূপৃষ্ঠে সম্পদের অসমান বন্টন দেখা যায় কেন?

খ) কোনো পদার্থ কিভাবে সম্পদে পরিণত হয়?

গ) মানব সম্পদ কেন গুরুত্বপূর্ণ?

ঘ) সম্পদ সংরক্ষণ কি?

ঙ) ধারনের বিকাশ কাকে বলে?

২। সঠিক উত্তর লেখ।

ক) সমুদ্রের জলে দ্রবীভূত মূল্যবান ধাতু কি প্রকার সম্পদ?

১) সর্বব্যাপী ২) বিকশিত ৩) প্রচ্ছন্ন ৪) জৈব।

খ) কোনটা মানবকৃত সম্পদ?

১) ডাক্তারী ওষুধ

২) ঝরনার জল

৩) মৃত্তিকা

৪) বায়ু

গ) কোনটা জৈব সম্পদ?

১) জঙ্গল

২) শিলা

৩) বায়ু

৪) জল

ঘ) কোনটা স্থানীয় সম্পদ নয়?

১) লোহা, ২) তামা, ৩) সোনা ৪) বায়ু

ঙ) কোনটা দ্রব্যকে সম্পদে পরিণত করার সহায়ক নয়?

১) উপযোগীতা, ২) পরিকল্পনা ৩) প্রয়োজনীয়তা ৪) প্রতিযোগিতা

৩। ক) প্রচ্ছন্ন ও বিকশিত সম্পদ খ) সর্বব্যাপী ও স্থানীয় সম্পদ

গ) নবীকরণ যোগ্য ও নবীকরণ অযোগ্য সম্পদ।

৪। তোমাদের কাজ ঃ

ক) আকবর বাদশার রাজ সভায় ছিলেন কবি অবেদুর রহিম খানখানা। তিনি লিখেছিলেন রহিমন পানি রখিয়ে বিন পাখি সনক্যাম।

এর অর্থ জল না থাকলে কিছুই থাকবেনা, না মানুষ না মোতি না কিছু। কবির লেখার গুরুত্ব বুঝে পৃথিবী জলশূণ্য হলে কি হবে ১০০টি শব্দে বর্ণনা কর।

খ) তুমি একটা পাথর, পাতা, কাগজ ও ছোট ডাল নাও। এসব সম্পদে কি কি করতে পারবে নিচের তালিকায় লেখ ঃ

পাথরের টুকরো ব্যাবহার করে	ব্যবহার/ উপযোগিতা
এক্কাদোক্কা খেলা	খেলনা
কাগজ উড়ে যাতে না যায়	সরঞ্জাম
মশলা গুড়ো করতে	সরঞ্জাম
বোতলের ছিপি খুলতে	সরঞ্জাম
বাগান ও ঘর সাজাবার জন্যে	সাজানোর জিনিষ
নিক্ষেপ করার জন্য	অস্ত্র

একটি কাঠি ব্যবহার করে	ব্যবহার/ উপযোগিতা

তুমি পাতার ব্যবহার করতে পারবে	ব্যবহার/ উপযোগিতা

ভূমি ছোট একটা ডাল ব্যবহার করতে পারবে	ব্যবহার/ উপযোগিতা

দ্বিতীয় অধ্যায়

ভূ-সম্পদ

ওড়িষ্যার মহানদীর ত্রিকোণ ভূমি অঞ্চলে জগৎ সিংপুর জেলায় সনাতন মহান্তির বাড়ি। সনাতনের বাবা একজন ছোট চাষী। তাঁর চাষ জমি কম হলেও, জমি সমতল, উর্ব্বর ও সেচ বাহিত। সনাতনের বাবা প্রাচীন পদ্ধতিতে চাষ করে যা ফসল ঘরে তোলে তাতে সংসার এবং সনাতনের পড়ার খরচা হয়ে যায়।

ম্যাট্রিক পাস করার পরে সনাতন দেখল উচ্চ শিক্ষার জন্যে বাবা খরচ যোগাড় করে উঠতে পারবে না পড়া ছেড়ে দিয়ে কি করবে সেই চিন্তায় রয়েছে। সেই সময় ওদের গাঁয়ে আসা কৃষি সম্প্রসারণ অধিকারীর সঙ্গে পরামর্শ করে আধুনিক চাষে বাবাকে রাজী করালো। রেহাইতি দামে একটা ট্রাক্টর কিনলো। তা দিয়ে নিজের জমি ও অন্যের জমি ভাড়া নিয়ে চাষ করেছিল। ফসল ও অন্যান্য জিনিষ গাড়ীতে চাপিয়ে কাছের বাজারে নিতে লাগল ও দুটো পয়সা রোজকার করল। গ্রামে পাকা বাড়ি করে দামী জিনিষ দিয়ে সাজিয়ে সুখে বাস করতে লাগল।

ঘটনা ক্রমে ভুবনেশ্বরে অনুষ্ঠিত এক আদিবাসী মেলায়, ধানু মাঝি নামে একজন আদিবাসীর সাথে দেখা হলো। কথায় কথায় সনাতন জানতে পারলো মালকান গিরির এক ছোট্ট গ্রামে ধানুর বাড়ি। সে অঞ্চলের জমি পাথুরে ও অনুর্বর। ঢালু পাহাড়ে সোপান কেটে তৈরীকরা ছোট ছোট কৃষি ক্ষেত্রগুলো যান্ত্রিক চাষের অনুপযুক্ত। দুর্ভিক্ষর সময়ে জল সেচনের সুবিধা নেই । চাষের কাজ না থাকলে বাবার সঙ্গে জঙ্গলে গিয়ে বনজাত দ্রব্য সংগ্রহ করে। ভারে করে বয়ে নিয়ে দূরের হাটে বিক্রী করে। তথাপি ওরা দিন গুজরান করতে পারে না। ওদের জীবন যাপন করা খুবই কষ্টকর।

উপরোক্ত দুই পরিবারের জীবন যাপন করা আলোচনা করলে বোঝা যায় যে সনাতনের পরিবার সুখে কিন্তু ধানুর সংসার খুব কষ্টে চলে। এদের জীবন যাপন প্রণালীর পার্থক্যর কারণ, মৃত্তিকার অবস্থা, জমির প্রকৃতি, জলের সুলভতা উদ্ভিদ ও মানুষের কর্মধারার পার্থক্য।

ভূ-সম্পদের বিতরণ ঃ ভূ-পৃষ্ঠ স্থল ভাগ ও জলভাগ নিয়ে গঠিত। স্থল ভাগ এক প্রাকৃতিক সম্পদ এবং মোট পৃথিবী পৃষ্ঠের শতকরা ২৯ ভাগ। সাতটি মহাদেশ নিয়ে গঠিত। সেগুলো হচ্ছে এশিয়া ইউরোপ উত্তর ও দক্ষিণ আমেরিকা আফ্রিকা, অস্ট্রেলিয়া ও আন্টার্টিকা। ক্ষেত্রফলে এশিয়া বৃহত্তম ও অস্ট্রেলিয়া ক্ষুদ্রতম। আন্টার্টিকা সর্ব্বদা বরফ আচ্ছাদিত বলে বাস উপযোগী নয়। প্রত্যেক মহাদেশ কয়েকটি দেশে বিভক্ত। ভারত এশিয়া মহাদেশের এক দেশ তেমনি ভারত কয়েকটা রাজ্যে বিভক্ত ওড়িশা ভারতের এক রাজ্য।

ভূ-সম্পদের প্রকার ভেদ ঃ সমুদ্রের তল থেকে স্থলভাগের দিকে ভূমির উচ্চতা ক্রমশ বৃদ্ধি পায়। উচ্চতানুসারে ভূভাগকে তিন ভাগে বিভক্ত করা হয়। অধিক উচ্চতার পাহাড় ও পার্ব্বত্য ভূমি। অল্প উচ্চতার বিস্তীর্ণ পাথুরে মালভূমি এবং সমুদ্র পত্তনের থেকে অল্প উচ্চতার সমান অঞ্চলকে সমতল ভূমি বলা হয়।

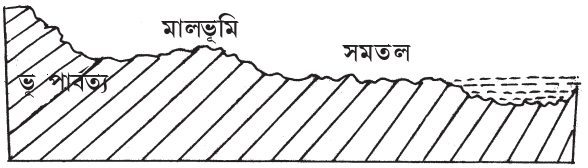

এশিয়ার হিমালয়, ইউরোপের আল্পস, উত্তর আমেরিকার রকি ও দক্ষিণ আমেরিকা আন্দিজ পর্ব্বতমালায় পৃথিবীর প্রধান পার্বত্য ভূমি অবস্থিত। সেই রকম এশিয়ার তিব্বত, গোবি ইউরোপের স্ক্যান্তিনেভিয়া উঃ আমেরিকার ক্যানাডিয়ান শিল্ড দঃ আমেরিকার ব্রাজিল ও পাটা গোনিয়া, আফ্রিকার অধিকাংশ অঞ্চল, পশ্চিম অস্ট্রেলিয়া, ভারতের দাক্ষিণাত্য মালভূমি ইত্যাদি পৃথিবীর মুখ্য মালভূমি। ভারতের হিমালয়, আরাবল্লী, বিন্ধ্য, পূর্বঘাট ও পশ্চিম ঘাট প্রভৃতি উচ্চ পাথুরে অঞ্চল পার্বত্য অঞ্চলের অন্তর্গত। পার্ব্বত্য ও মালভূমির ওপর স্তরে মৃত্তিকা পাথুরে ও তার জলধারণ ক্ষমতা কম, অতএব সেই অঞ্চলে কৃষি কার্য্য লাভজনক নয়।

বিভিন্ন নদী উপত্যকা, ত্রিকোণ ভূমি এবং সমুদ্র উপকূলে সমতল ভূমি দেখা যায়। পৃথিবীর মুখ্য সমতল ভূমি গুলোর মধ্যে। এশিয়ার সাইবেরিয়া উত্তর আমেরিকার সমতল ভূমি, দক্ষিণ আমেরিকার আমাজন ও পারানা পারাগুয়ে অববাহিকা এবং আফ্রিকার নীলনদ ও কঙ্গো নদী অববাহিকা উল্লেখযোগ্য।

ভারতের গাঙ্গেয় ও উপকূলবর্তী অঞ্চল, ওড়িশার মহানদীর অববাহিকা ও বঙ্গোপসাগরের উপকূল অঞ্চল সমতল ভূমি রূপে পরিচিত।

সমতল ভূমির মৃত্তিকা স্তর ঘন ও জল ধারণের ক্ষমতা বেশী হওয়ায়, কৃষিকার্য্য লাভ দায়ক।

ভূ-ব্যবহার ঃ মানুষ জীবিকা নির্বাহ করতে ভূসম্পদকে বিভিন্ন রূপে ব্যবহার করে। বসতি স্থাপন কৃষি কর্ম, পশুপালন, গমনা গমন, পথ নির্মান, বনসৃজন, খনি উত্তোলন, কলকারখানা ও বাণিজ্য কেন্দ্র স্থাপন প্রভৃতি কাজে ব্যবহার করে। একে ভূ-ব্যবহার বলা হয়।

তোমার কাজ ঃ
তোমার অঞ্চলের বিভিন্ন স্থানে থাকা ভূমি ও মৃত্তিকার প্রকার ও জলের লভ্যতা লক্ষ করে লোকেদের জীবনে কি প্রভাব বিস্তার করছে। আলোচনা করা।

কোনো অঞ্চলের ভূমি কি কাজে ব্যবহার করা হবে ও সেই কাজ কি উপায়ে করা যেতে পারবে, সেটা সেই অঞ্চলের দু প্রকার অবস্থার ওপরে নির্ভর করা হয়।

যথাঃ প্রাকৃতিক অবস্থা ও মানবীয় অবস্থা। প্রাকৃতিক অবস্থার মধ্যে সেখানকার ভূপ্রকৃতি, মৃত্তিকা, জলবায়ু, খনি এবং জলের সুলভতা ইত্যাদি। মাননীয় অবস্থার মধ্যে সেখানকার জনসংখ্যা, শিক্ষাকারি গরী কৌশল, বৈষয়িক জ্ঞান ও প্রয়োগ ইত্যাদি। এই অবস্থা পৃথিবীর সর্বত্র সমান নয়। তাই বিভিন্ন অঞ্চলে বিভিন্ন ভাবে ভূমি ব্যবহার করা হয়।

তোমরা জানো কি ?

পৃথিবীর স্থলভাগের ৩০ ভাগ জমিতে পৃথিবীর ৯০ ভাগলোকে বসবাস করে। সেগুলো জনবহুল অঞ্চল।

অবশিষ্ট ৭০ ভাগ অঞ্চলে মাত্র ১০ ভাগ লোকে বসবাস করে। সেগুলোকে বলে জনবিরল অঞ্চল।

পৃথিবীর বাছা বাছা দেশে ভূমি ব্যবহারের নমুনা (শতকরা হিসাবে)

দেশের নাম	কৃষি জমি	চারন ভূমি	বনভূমি	অন্যান্য	
অস্ট্রেলিয়া	৬ শতাংশ	৫৬ শতাংশ	১৪ শতাংশ	২৪ শতাংশ	
ব্রাজিল	৯ শতাংশ	২০ শতাংশ	৬৬ শতাংশ	৫ শতাংশ	
কানাডা	৫ শতাংশ	৪ শতাংশ	৩৯ শতাংশ	৫২ শতাংশ	
চীন	১০ শতাংশ	৩৪ শতাংশ	১৪ শতাংশ	৪২ শতাংশ	
ফ্রান্স	৩৫ শতাংশ	২১ শতাংশ	২৭ শতাংশ	১৭ শতাংশ	
ভারত	৫৭ শতাংশ	৪ শতাংশ	২২ শতাংশ	১৭ শতাংশ	
জাপান	১২ শতাংশ	২ শতাংশ	৬৭ শতাংশ	১০ শতাংশ	
রাশিয়া	৮ শতাংশ	৫ শতাংশ	৪৪ শতাংশ	৪৪ শতাংশ	
যুক্ত রাজ্য	২৯ শতাংশ	৪৬ শতাংশ	১০ শতাংশ	১৬ শতাংশ	
আমেরিকা	২১ শতাংশ	২৬ শতাংশ	৩২ শতাংশ	২১ শতাংশ	
পৃথিবী	১১ শতাংশ	২৩ শতাংশ	৩১ শতাংশ	৩২ শতাংশ	

তালিকাটি পড়ে নিচের প্রশ্নের উত্তর দাও।

প্রশ্ন ঃ কোন কোন দেশে কৃষি, চারণ, অরণ্য ও অন্যান্য কাজে সর্বাধিক শতাংশ জমি ব্যবহার করা হয়?

ভারতের ভূমি মূলতঃ অরণ্য, চারণ, কৃষি, জনবসতি, কলকারখানা ও রাস্তাঘাট প্রভৃতিতে ব্যবহার করা হয়। ভারতের সমগ্র জমির ৫৪ শতাংশ ভাগ কৃষি, ১৯ শতাংশ ভাগ জনবসতি ও মাত্র ৪ শতাংশ ভাগ স্থায়ী চারন ও গোচর ভূমি রূপে ব্যবহার হয়। জাতীয় অরণ্য নীতি অনুসারে পরিস্থিতি সমতার জন্যে দেশের মোট আয়তনের ৩৩ ভাগ জমি বনসৃজনের প্রয়োজন স্থলে মাত্র ২২ শতাংশ ভূমি অরণ্য আচ্ছাদিত রয়েছে। ওড়িষ্যার ৪৭ শতাশে ভাগ ভূমি কৃষি কার্য্য ১৩ শতাংশ ভাগ জনবসতি ও ৫ শতাংশ ভাগ চারণ এবং গোচর ভূমি ও ৩২ শতাংশ ভাগ অরণ্য রূপে ব্যবহৃত হচ্ছে।

তোমার কাজ ঃ তোমার পরিবার কিম্বা পাড়ার কোনো বয়োজেষ্ঠ ব্যক্তির কাছ থেকে, তোমার বসবাস অঞ্চলে কালক্রমে ভূ ব্যবহারের পরিবর্ত্তন সম্পর্কে কিছু ঘটে যাওয়া ঘটনা জানতে পারলে তোমার শ্রেণী কক্ষে আলোচনা কর।

আজকাল জনসংখ্যা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে জমির চাহিদাও বৃদ্ধি পাচ্ছে। কিন্তু মানুষের ব্যবহার উপযোগী জমি সীমিতই রয়েছে। আজকের যুগে মানুষের সামাজিক ও সাংস্কৃতিক চেহারা এত দ্রুত বৃদ্ধি পাচ্ছে যে তা ভূমি ব্যবহারের চেহারাই পাল্টে দিচ্ছে। শহরাঞ্চলের লোকেরা সর্বসাধারণের ব্যবহৃত স্থান, জোর করে দখল করে বসতি স্থাপন করছে। গ্রামাঞ্চলের লোকেরাও সর্বসাধারণের ব্যবহার করা স্থান জবর দখল করে চাষ করতে পিছপা হচ্ছে না। রাস্তাঘাট ও বাসস্থানের জন্য ও অধিকতর জমি ব্যবহৃত হচ্ছে। এইসব মানবীয়

কারণ ছাড়াও ভূমি অবক্ষয়ের জন্য ভূক্ষয় মৃত্তিকা ক্ষয়, মরু করণ ও সুনামির মত সামুদ্রিক ঢেউ প্রভৃতি কয়েকটি কারণও দায়ী।

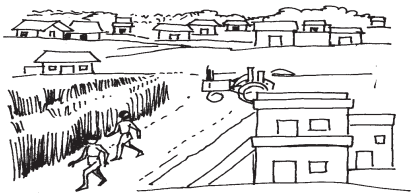

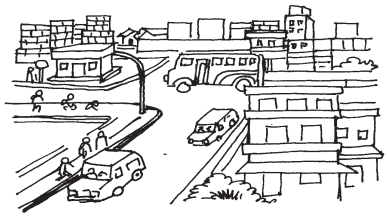

(ভূমি ব্যবহারে কালক্রমে পরিবর্ত্তন)

ভূ সম্পদের সংরক্ষণ ঃ সভ্যতার বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে ভূসম্পদের ব্যবহার প্রতিদিন বেড়ে চলেছে। যার ফলে ব্যবহার উপযোগী ভূমির আয়তন বৃদ্ধি হওয়া আবশ্যক হয়ে পড়ছে। কিন্তু ভূমির অবক্ষয়ের ফলে ভূসম্পদের আয়তন দিনকে দিন কমে যাচ্ছে। সেই জন্য ভূমি অবক্ষয়ের রক্ষা করা একান্ত প্রয়োজন হয়ে পড়েছে।

ভূমি অবক্ষয় রুখতে নিম্নলিখিত সতর্কতার পদক্ষেপ নেওয়া একান্ত আবশ্যক।

পাহাড়ি অঞ্চলের তীক্ষ্ম ঢালু অঞ্চলে শক্তকাঠের বৃক্ষ রোপন কিম্বা পাথুরে দেওয়াল নির্মাণ করলে ধসের সম্ভাবনা কমে ঢালু অঞ্চল সুরক্ষিত থাকবে। পাহাড়ের ঢালে ভূস্খলনের প্রধান কারণ হচ্ছে বৃষ্টির জল। বৃষ্টির জলের ধারাকে নালা কেটে নীচে প্রবাহিত করার ব্যবস্থা করলে ভূস্খলন রোধ করে। নদীর বাঁকে ছোট ছোট বাঁধ দিলে তীরের মাটি ভাঙা বন্ধ করা যায়।

সমুদ্রতীরে নোনা জঙ্গল নষ্ট না করে বালির ওপর বেশী করে ঝাউ গাছ লাগালে, সমুদ্রের উঁচু ঢেউ ও বাত্যা জনিত কূলক্ষয় হ্রাস পায়।

মৃত্তিকা ঃ একবার ভুবনেশ্বর বানীবিহার উচ্চ বিদ্যালয়ের ছাত্ররা ফুটবল ম্যাচ খেলতে, কটক জেলার গ্রামাঞ্চলে আলি পিঙ্গল উচ্চ বিদ্যালয়ে গেছিল। খেলা শুরু হওয়ার পাঁচ মিনিট পরেই বৃষ্টি হয়ে মাঠ কর্দ্দমাক্ত হয়ে গেল। সেই জন্যে খেলা বন্ধ করে পরের দিন পিছিয়ে দেওয়া হলো। ছেলেদের পা থেকে হাঁটু পর্য্যন্ত কাদায় ভরে যাওয়ায় ওরা স্কুলের নলকূপ টিপে হাত পা ধুয়ে পা টিপে টিপে স্কুলের হল ঘরে গিয়ে বিশ্রাম নিতে লাগল।

গোপাল বলে একটা ছেলে শিক্ষককে বলল — "সার আমরা তো আমাদের স্কুলের মাঠে বৃষ্টি হলেও খেলি। পায়ে কাদা লাগে না। কিন্তু এখানে অল্প বৃষ্টিতেই মাঠে এত কাদা হলো কেন? শিক্ষক উত্তর দিলেন — আমাদের স্কুলের ভূ অঞ্চল এখানকার চেয়ে আলাদা। ওখানে বালি কাঁকড় যুক্ত মাটি। কিন্তু এখানকার মাটিতে বালি কাঁকড়ের পরিমাণ খুব কম। তাই অল্প বৃষ্টিতেই মাঠে এত কাদা হয়ে যায়

চুর্নি ভবন প্রক্রিয়া ঃ ভূপৃষ্ঠের উন্মুক্ত শিলা, উত্তাপের হ্রাস বৃদ্ধি, ভূকম্পনের প্রভাব, উদ্ভিদ, প্রাণী এবং মনুষ্যের দ্বারা খন্ডিত হয়ে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র চুর্নিত রেণুতে পরিণত হওয়ার প্রক্রিয়া।

মাটির অন্য নাম মৃত্তিকা। ভূপৃষ্ঠের ভূমি যেসব পদার্থ নিয়ে গঠিত তার মধ্যে মৃত্তিকা অন্যতম। মৃত্তিকা শিলা বা পাথর থেকে সৃষ্টি হয়। শিলা ক্ষয় হয়ে সূক্ষ্ম ক্ষয় হয়ে সূক্ষ্ম শিলা রেণুতে পরিণত হয়। সেই রেণু মৃত্তিকা গঠনের প্রধান উপাদান। বিভিন্ন শিলার ক্ষয়জনিত সূক্ষ্ম রেণু, জল বায়ু ক্ষয় প্রাপ্ত জৈবাংশ ও খনিজ পদার্থের সঙ্গে মিশে ভূমির উপরিভাগে যে পাতলা আস্তরণ সৃষ্টি করে, তাকে মৃত্তিকা বলা হয়। মৃত্তিকা ভূমির সঙ্গে সম্পৃক্ত। তাই কোন অঞ্চলের মৃত্তিকা কি ধরণের হবে। তা সেই অঞ্চলের ভূরূপ থেকেই বোঝা যায়। মৃত্তিকায় সূক্ষ্ম শিলা রেণুর সঙ্গে জল, বায়ু খনিজ পদার্থ ইত্যাদি বিভিন্ন জিনিষ মিশে থাকে। তাই মৃত্তিকা এক যৌগিক পদার্থ। মৃত্তিকায় সঠিক ভাবে খনিজ ও জৈবাংশ মিশে থাকলে তা অতি উর্ব্বর হয়।

তোমরা জানো কি?

চুর্ণীভবন প্রক্রিয়া এত দীর্ঘ যে ১ সেন্টিমিটার ঘন মৃত্তিকা সৃষ্টি হতে শয়েশয়ে বছর লেগে যায়।

মৃত্তিকা গঠনের নিয়ামক ঃ

মৃত্তিকা যে প্রাথমিক শিলা থেকে সৃষ্টি হয়, সেই প্রাথমিক শিলা, মৃত্তিকার রঙ, বিন্যাস রাসায়নিক গুণ, ভেতরে মিশে থাকা খনিজ পদার্থ ও ভেদ্যতাকে প্রভাবিত করে। মৃত্তিকা যে ভূভাগে সৃষ্টি হয়, সেখানকার ভূপ্রকৃতি যথাঃ উচ্চতা ও ঢালুর অংশ দ্বারা সঞ্চয় প্রভাবিত হয়ে থাকে। মৃত্তিকা সৃষ্টি হওয়া অঞ্চলে উদ্ভিদ, প্রাণী ও ক্ষুদ্রতম জীবেরা মাটিতে থাকা জৈবাংশের পরিমাণকে প্রভাবিত করে থাকে। মৃত্তিকা সৃষ্টি হওয়া অঞ্চলে জলবায়ু যথা, উষ্ণতা ও বৃষ্টিপাত, মৃত্তিকার ক্ষয় এবং জৈবাংশর অনুপাত প্রভাবিত করে।

মৃত্তিকা সৃষ্টির নিয়মাক ও তাদের প্রভাব ঃ

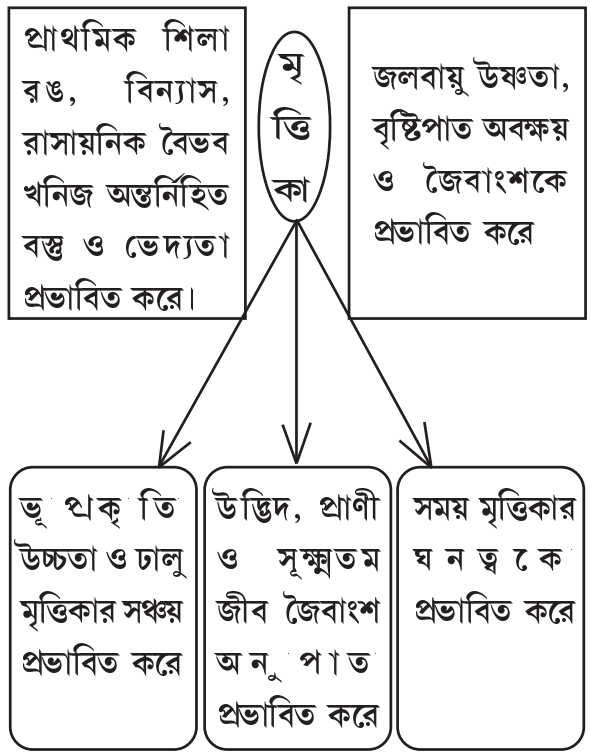

মৃত্তিকার গঠন প্রণালী লক্ষ করলে জানা যায় যে নিম্নভাগে প্রাথমিক শিলা, তার উপরে চুর্ণীভুত শিলা দ্রব্য, তার ওপরে বালি পলি মাটি ও কাদা মিশ্রিত উপমৃত্তিকা স্তর এবং তার ওপরে জৈবাংশ উদ্ভিদ সম্মিলিত মৃত্তিকা স্তর থাকে। কুঁয়ো বা নলকূপ খোঁড়ার সময় উঠে আসা বস্তুদের ক্রমানয়ে সাজিয়ে রাখলে এর সঠিক রূপ বোঝা যায়।

মৃত্তিকার গঠন প্রণালী (Soil Profile) ঃ

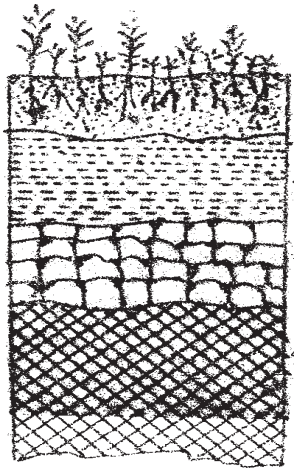

মৃত্তিকার শ্রেণী বিভাগ ঃ

গঠন শৈলী অনুসারে মৃত্তিকা দুভাগে বিভক্তঃ যথাঃ পরিবাহিত মৃত্তিকা ও অবশিষ্ট মৃত্তিকা। শিলা ক্ষয়িত হয়ে ক্ষয়জাত পদার্থ প্রাকৃতিক শক্তি দ্বারা অন্যত্র সঞ্চিত হয়ে যে মাটি সৃষ্টি হয়, তাকে পরিবাহিত মৃত্তিকা বলে। এই মৃত্তিকা যেখানে সঞ্চিত হয় সেথায় থাকা অন্তর ভূমির সঙ্গে তার কোনো সামঞ্জস্য থাকে না। উদাহরণ পলি মাটি।

তোমার কাজ ঃ

তোমার অঞ্চলের বিভিন্ন মাটি সংগ্রহ করে তার শ্রেণী বিভাজন করে দেখাও।

শিলাক্ষয় হওয়ার পরে ক্ষয়িত শিলা সেই স্থানে বিপুল জমা হয়ে যে মৃত্তিকা সৃষ্টি করে, তাকে অবশিষ্ট মৃত্তিকা বলা হয়। এই মৃত্তিকার অন্তর্ভূমির সঙ্গে সামঞ্জস্য থাকে।

অবশিষ্ট মৃত্তিকার তুলনায় পরিবাহিত মৃত্তিকা অধিক উর্ব্বর (কেন?) উদাহরণ স্বরূপ কৃষ্ণমৃত্তিকা (কালো মৃত্তিকা ক্ষয়িত শিলারেণুর আকার ও পরিমাণ বিচার করে মৃত্তিকাকে চার শ্রেণীতে বিভক্ত করা হয়। যথাঃ পলি, বেলে দোআঁশলা ও এঁটেল।

বেলে মাটিতে অধিক পরিমাণে বালি ও কম পরিমাণে পলি মাটি থাকে। পলি মাটিতে বেশী পরিমাণে সূক্ষ্ম শিলারেণুর সঙ্গে জৈবাংশ মিশে থাকে।

বালি ও পলিমাটির সম পরিমান মিশ্রণকে দোআঁশলা মাটি বলে। অতি মাত্রায় সূক্ষ্ম শিলারেণুর পরিমাণের সঙ্গে কম পরিমাণের পলি মাটি থাকলে তাকে এঁটেল মাটি বলা হয়।

মাটিতে মিশে থাকা বিভিন্ন খনিজ পদার্থের রঙের প্রভাবে বিভিন্ন রঙের মৃত্তিকা দেখা যায় যথাঃ কৃষ্ণ, লোহিত পীত ইত্যাদি।

মৃত্তিকার বিতরণ ঃ

মৃত্তিকা গঠনের প্রধান নিয়ামক যথাঃ ভূপ্রকৃতি, জলবায়ু ও প্রাকৃতিক উদ্ভিদ পৃথিবীর সব অঞ্চলে সমান নয় বলে বিভিন্ন স্থানে মৃত্তিকার গুন, মান ও রঙ আলাদা হয়।

<u>ভারতের মৃত্তিকার বিতরণ</u> ঃ

মৃত্তিকার নাম	অঞ্চল
পলিমাটি ঃ	ভারতের সমস্ত নদী উপত্যকা ত্রিকোণ ভূমি গাঙ্গেয় উপত্যকায় দেখতে পাওয়া নতুন পলিমাটিকে খদর ও পুরোনো মাটিকে ভাঙর বলা হয়।
কৃষ্ণ ও লোহিত মৃত্তিকা ঃ	মহারাস্ট্র, অন্ধ্র, গুজরাট, তামিলনাড়ু ও মধ্যপ্রদেশ
লোহিত ও পীত মৃত্তিকা ঃ	ছত্তিশগড় ওড়িশা, ঝাড়খন্ড, মহারাস্ট্র, কর্নাটক ও অন্ধ্রপ্রদেশ।

মৃত্তিকার নাম	অঞ্চল	মৃত্তিকার নাম	অঞ্চল
অরণ্য মৃত্তিকা ঃ	হিমালয়, পূর্বঘাট, পশ্চিমঘাট ও মালভূমি অঞ্চল।	নোনা ও ক্ষার মৃত্তিকা ঃ	সমুদ্রোপকূল শুষ্ক ও অর্ধ্যশুষ্ক অঞ্চল।
মরুস্থলী মৃত্তিকা	রাজস্থান, হরিয়ানা ও পাঞ্জাব	পিট্ ও জৈব	
ল্যাটেরাইট (মোরম) মৃত্তিকা	দাক্ষিণাত্য মালভূমি, কর্নাটক, মহারাস্ট্র, মধ্যপ্রদেশ, ওড়িশা, ঝাড়খন্ড প্রভৃতি।	মৃত্তিকা ঃ	কেরল, ওড়িশা, পশ্চিমবঙ্গ ও তামিলনাড়ুর উপকূলবর্তী অঞ্চল।

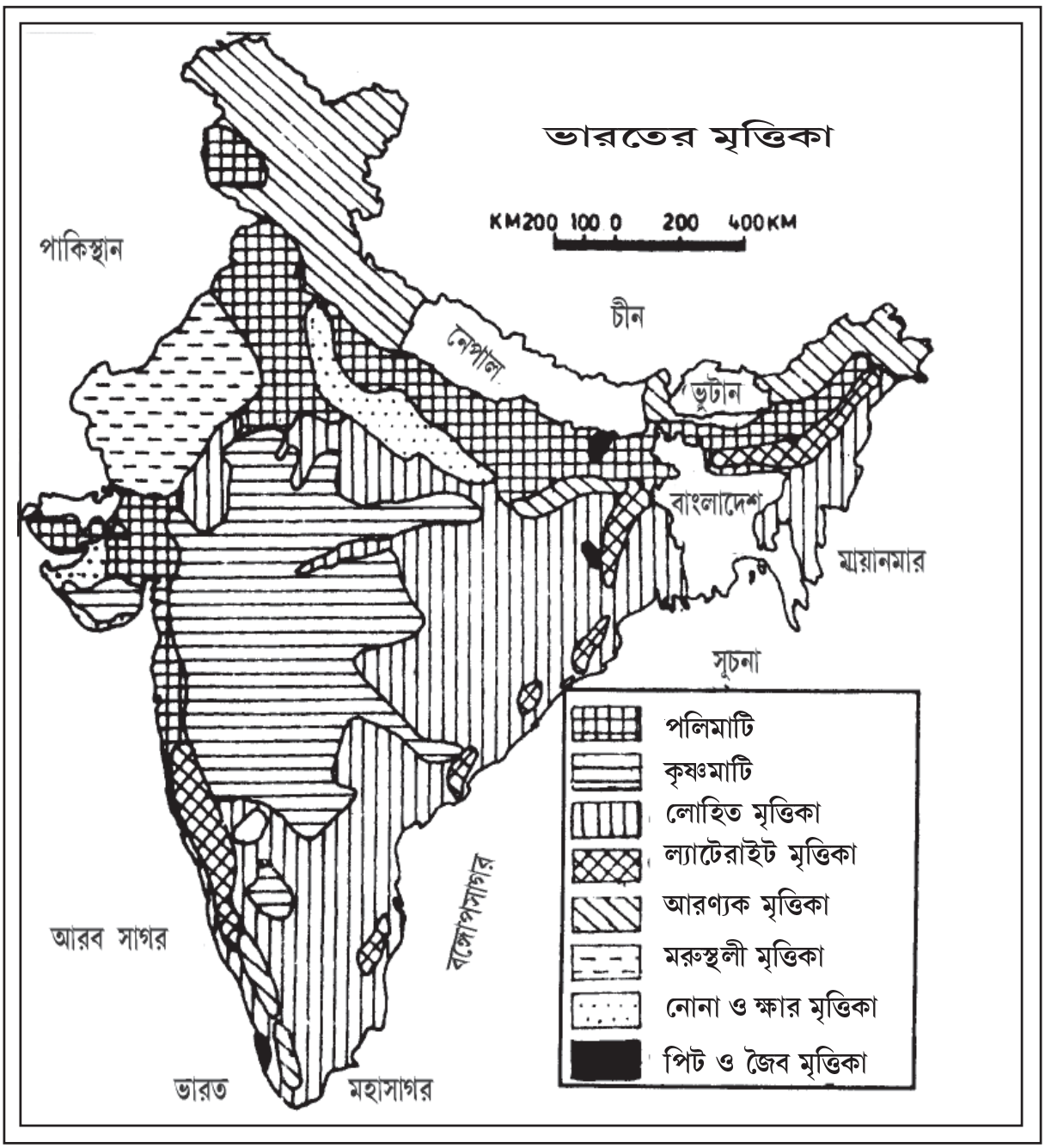

ওড়িষ্যার মৃত্তিকার বিতরণ ঃ

ওড়িষ্যার ত্রিকোণ ভূমি ও সমুদ্র উপকূলবর্তী অঞ্চলে নোনা মাটি দেখা যায়। নদী উপকূলে পলিমাটি, পর্বতমালার পাদদেশে ল্যাটেরাইট, পাহাড়ি অঞ্চলে লালমাটি ও বাদামি রঙের মাটি দেখতে পাওয়া যায়। অনুগুল আঠমল্লিক ও বৌদ্ধ অঞ্চলে কালো রঙের মাটির দেখা পাওয়া যায়।

মৃত্তিকার ব্যবহার ঃ

পৃথিবীর সব প্রাণী, উদ্ভিদ সবাই খাদ্যের জন্যে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষে মৃত্তিকার ওপর নির্ভর করে।

(সোপান কৃষি জমি)

মৃত্তিকার সংরক্ষণ ঃ

বৃষ্টি, বন্যা, জলপ্রবাহ ভুস্খলন প্রভৃতি প্রাকৃতিক কারণ এবং জঙ্গল বিনাশ, অধিক চারণ, রাসায়নিক সার ও কীট নাশকের ব্যবহার , অত্যধিক খনি উত্তোলন প্রভৃতি মানবীয় কারণে মৃত্তিকা ক্ষয় হয়। মৃত্তিকা ক্ষয়যীল হলেও নবীকরণ যোগ্য সম্পদ কারণ উর্ব্বরতা হ্রাস পেলে গোবর ইত্যাদি সার দিয়ে উৎপাদনক্ষম করা সম্ভব। কিন্তু নূতন মৃত্তিকা সৃষ্টি করা দীর্ঘ সময় সাপেক্ষ। সেইজন্য এই গুরুত্বপূর্ণ সম্পদের সংরক্ষণের প্রতি বিশেষ যত্নবান হওয়া প্রয়োজন।

মৃত্তিকা কৃষি কার্য্যে ব্যবহার করে মানুষ খাদ্য শষ্য উৎপাদন করে নিজের খাদ্য রূপে গ্রহণ করে। মৃত্তিকার উৎপন্ন তন্তু জাতীয় দ্রব্য যথা কার্পাস, পাট প্রভৃতি থেকে বস্ত্র তৈরী করে ব্যাবহার করে। মানুষের ব্যবহার করা চা, কফি, আখের রস ইত্যাদি পানীয় ফসল ও মাটিতে উৎপন্ন হয়। গ্রামাঞ্চলের লোকেরা কাঁচা মাটির ঘরদোর তৈরী করে বাস করে। শহরে লোকেরা মাটি থেকে ইঁট তৈরী করে গৃহ নির্মাণ কাজে ব্যবহার করে। কুটির শিল্পে মাটির পুতুল, হাঁড়ি কলসি প্রভৃতি করা হয়। উৎপন্ন কৃষিজাত দ্রব্য বিভিন্ন শিল্পে কাঁচামাল হিসেবে ব্যবহৃত হয়।

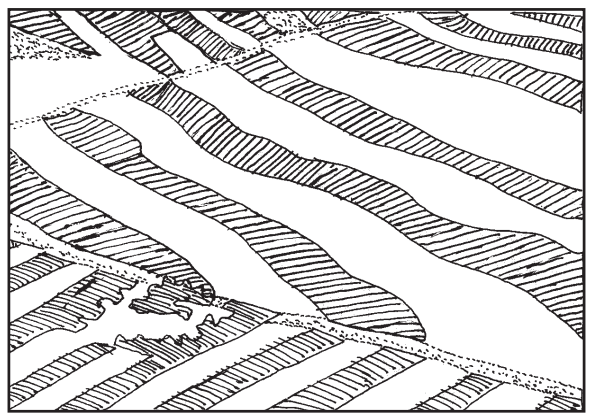

শুষ্ক মৃত্তিকা আদ্র মাটির চেয়ে বেশী ক্ষয়শীল। তাই দুই উদ্ভিদের মধ্যবর্তী স্থান খড়কুটো ইত্যাদির দ্বারা মাটি আচ্ছাদিত করে রাখলে মৃত্তিকার আদ্রতা বেশী দিন ধারিত হয়, ফলে মাটির ক্ষয় দেরীতে হয়।

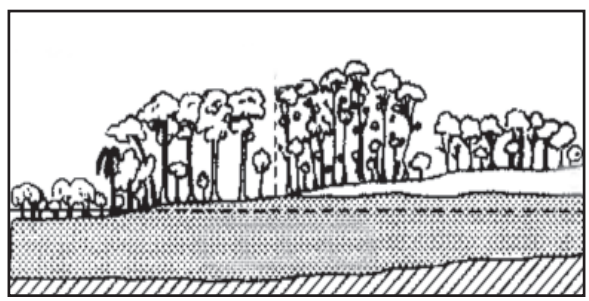

সম উচ্চতা বিশিষ্ট স্থানগুলি ঘাস, মাটি, পাথর দিয়ে বেঁধে দিয়ে সামনে সামান্য নালা কেটে রাখলে এবং গর্ত করে রাখলে, জল প্রবাহিত না হয়ে জমা হয়ে যায়। ফলতঃ ভূমিক্ষয় প্রতিরোধ করে।

জল প্রবাহের গতি পথে পাথর রাখলে স্রোত কম হয় এবং ভূমিক্ষয় রোধ করা যেতে পারে।

উঁচু পাহাড়ের ঢালু অংশকে কেটে মোটামুটি সমতল ক্ষেত্র প্রস্তুত করলে চাষের সুরাহা হয় এবং জল প্রবাহের বেগ কমে গিয়ে ভূমিক্ষয় রোধে সাহায্য করে। একটি কৃষি ক্ষেত্রে বিভিন্ন ফসল বিভিন্ন সময়ে চাষ করলে মৃত্তিকাকে বর্ষাজনিত ক্ষতির হাত থেকে রক্ষা করা যায়। উপকূল এবং শুষ্ক অঞ্চলে বায়ুর বিপরীতে লাইন করে গাছ লাগালে বায়ুর বেগ জনিত হ্রাসের ফলে মৃত্তিকা ক্ষয় রোধ করা যায়।

তোমার কাজ ঃ

তুমি যেখানে বাস করো, সেখানকার মাটির বিভিন্ন প্রকার অবস্থা বর্ণনা কর।

পশুচারণ নিয়ন্ত্রিত করা গেলে মাটির তৃণ আচ্ছাদন বহাল থাকায় ভূমিক্ষয় রোধ করা যায়। ভূমিতে রাসায়নিক সার ও কীটনাশক ব্যবহারের ফলে ওপরে রাসায়নিক প্রভাব পড়ে। এটা নিয়ন্ত্রণ করলে মৃত্তিকার ক্ষয় কম হয়।

মৃত্তিকা ক্ষয়ের কুপরিনাম ও সংরক্ষণের বিষয়ে গুরুত্ব দিয়ে জনসচেনতা বাড়ালে মৃত্তিকার ক্ষয় রোধ হওয়া কমানো যেতে পারবে।

জল সম্পদ

কালা হান্ডি জেলার বিদ্যালয়ের শিক্ষক তাঁর ছাত্রদের নিয়ে পারাদ্বীপ বন্দর বেড়াতে এসে এক হোটেলের দুটো ঘর ভাড়া নিলেন। সন্ধ্যে বেলায় কটক রানীহাট বিদ্যালয়ের শিক্ষক তাঁর ছাত্রদের নিয়ে সেই হোটেলে পৌঁছলেন। শিক্ষকদের কথাবর্ত্তায় কালাহান্ডির ছাত্ররা জানতে পারলো কটকের ছাত্ররা সমুদ্রের কাছে এক ছোট্ট দ্বীপে গিয়ে বনভোজী করে ফিরে এসেছে। তাই শুনে কালা হান্ডির ছাত্ররা শিক্ষককে বনভোজীর জন্যে অনুরোধ করায় শিক্ষক রাজি হলেন। সব কিছুর আয়োজন করে একটা নৌকা ভাড়া করা হলো। পরের দিন ভোরবেলায় মাঝি এসে সবকিছু নৌকায় সাজিয়ে রাখল তীর ছাড়ার আগে মাঝি বলল ছেলেরা রান্না আর খাবর জল নিয়েছ তো? দ্বীপে মধুর জল পাওয়া যায়না। কারণ নিচু হবার ফলে অধিকাংশ সময়ে জোয়ারের জল চেপে আসে। বালির তলাতেও নোনা জল বেরোয়। শুনে ছেলেরা পানীয় জল নিয়ে নিল।

ওখানে গিয়ে শিক্ষক বললেন ‘‘দেখলে তো মাঝি কত হুঁশিয়ার ব্যাক্তি। কত বড় বিপদ থেকে রক্ষা করল। খাদ্য না খেলেও ১বেলা কাটানো যায় কিন্তু জলছাড়া থাকতে পারবে কি?

তোমরা জানো কি? ১৯৭৫ সালে, কেবল মানুষের ব্যবহারে বার্ষিক ৩৮৫০ ঘন কি.মি. জল খরচা হয়েছিল। কিন্তু ২০০০ সালে সেটা বেড়ে ৬০০০ ঘন কি.মি. হয়েছিল।

জল ও এর বিতরণ ঃ

জল এক নবীকরণ যোগ্য অমূল্য সম্পদ। আমরা জানি পৃথিবীর ভূপৃষ্ঠ ৭১ ভাগ জল ও ২৯ ভাগ স্থল দ্বারা আবৃত্ত। তাই পৃথিবীকে এক জলীয় গ্রহ বলা হয়। পৃথিবীর সমস্ত জলভাগ বিভিন্ন মহাসাগরে বিভক্ত। মহাসাগরে ৩০-৫০ কোটি বছর পূর্বে জীব জগত সৃষ্টি হওয়ার অনুমান করা হয়। অতএব মহাসাগরে বিভিন্ন প্রকার উদ্ভিদ ও প্রাণী থাকা কিছু নতুন কথা নয়। সমুদ্রের জল নোনা বলে মানুষের ব্যবহার উপযোগী নয়। পৃথিবীতেথাকা সমগ্র জলের মাত্র ২.৭ ভাগ পানযোগ্য। আবার এর মধ্যে শতকরা ৭০ ভাগ জল আর্ন্টাকটিকা, গ্রীণল্যান্ড ও উঁচু পাহাড়ের ওপর বরফ হয়ে আছে। পৃথিবীর মিষ্টি জলের মাত্র ১ শতাংশ ভাগ মানুষের ব্যবহারে লাগে। সাধারণ ভাবে এই জল মাটির তলায়, এবং নদী হ্রদ ও জলীয় বাষ্পের আকারে বায়ুমণ্ডলে মিশে থাকে।

এই কারণে মিষ্টি বা মধুর জল পৃথিবীর অতি অমূল্য সম্পদ। পৃথিবীর জলের মোট পরিমাণ সর্বদা সমান থাকে। স্থল বিশেষে এর পরিমাণ কম বেশী হয়। জল বাষ্প হয়ে সমুদ্র থেকে উঠে বায়ু মণ্ডলে মিশে যায়। তার পরে ঘনীভূত হয়ে মেঘে পরিণত হয়ে বৃষ্টিপাত ও তুষারপাত হয়ে পৃথিবীর জলে ও স্থলে ঝরে পড়ে। বৃষ্টি হয়ে স্থলভাগে পড়া কিছুটা জল ভূতলে প্রবেশ করে সঞ্চিত হয়। বাকী অংশ নদীনালা ঝরনা ইত্যাদির ধারা বয়ে গিয়ে পুনরায় সমুদ্রে মিশে যায়। একে জল প্রবাহ বলা হয়। জল সাগর থেকে বায়ুমণ্ডলে, তার থেকে ভূপৃষ্ঠে ও পুনরায় সাগরে মিশে যাওয়াকে জলচক্র বলা হয়।

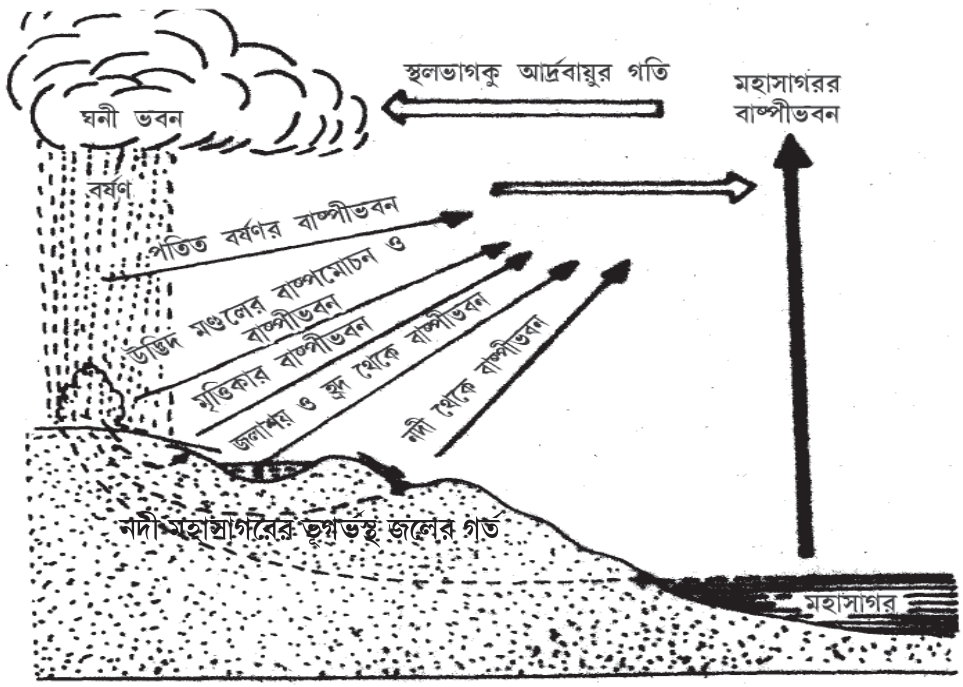

চিত্র - ২.৪
জলচক্রর চিত্র

স্থলভাগে জলের আবন্টন ঃ		মুখ্য হ্রদ ঃ
স্থানের নাম	**মুখ্য নদী**	
পৃথিবী	ইরাবতী, হোয়াঙহো, ইয়াংসিকিয়াং, ওব্, ইনসি, লেনা, টাইগ্রীস, ইউফ্রেটিস, ভলগা, রাইন, রোন, মিসৌরি মিসিসিপি, সেন্টলরেনস্, আমাজন, পারানা পারাগুয়ে, নীলনদ, কঙ্গো, মরে ডার্লিং ইত্যাদি।	উরাল, বৈকাল, কাস্পিয়ান, ইরি, ওন্টারিও, সুপিরিয়র, মিশিগান, হিউরন, ভিক্টোরিয়া, আলবার্ট, এড্ওয়ার্ড।
ভারত ঃ	গঙ্গা, ব্রহ্মপুত্র, গোদাবরী, কৃষ্ণা, কাবেরী, নর্মদা, তাপ্তি, শতদ্রু, রাবি, বিপাশা ইত্যাদি।	চিলিকা, ডাল্, সম্বর
ওড়িষ্যা ঃ	মহানদী, ব্রাহ্মণী, বৈতরণী, সুবর্ণরেখা, ঋষিকুল্যা ইত্যাদি।	চিলিকা, অংশুপা।

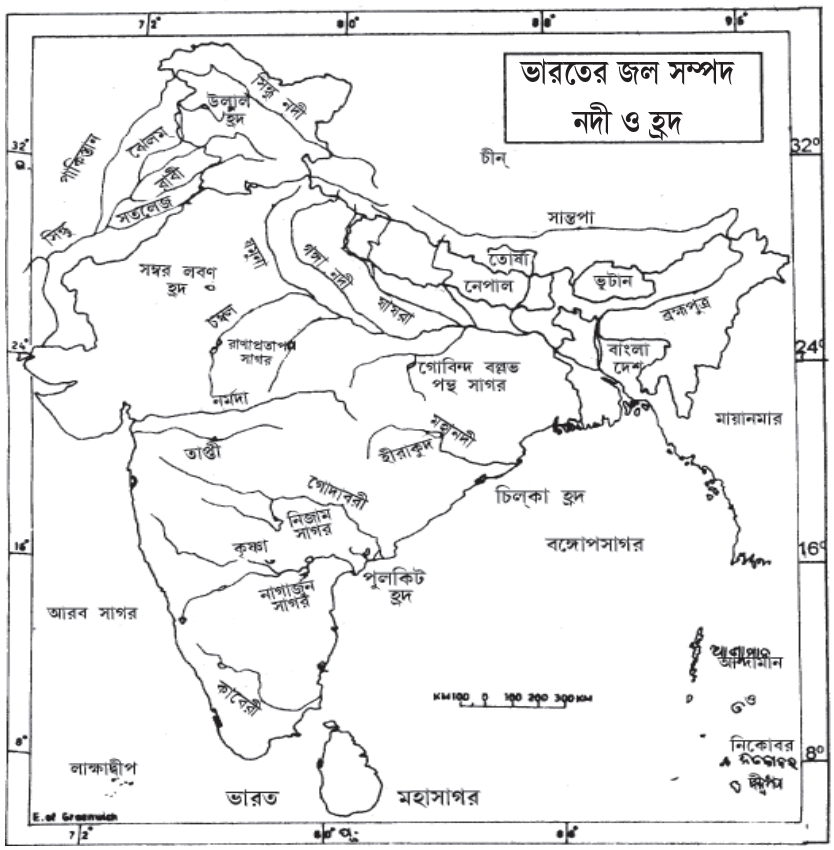

মানচিত্র

জলের ব্যবহার ঃ

মানুষ জল পানীয়, রান্না ও পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন করার কাজে ব্যবহার করে। এছাড়া বিভিন্ন ভাবে যথা কৃষি, শিল্প বিদ্যুত শক্তি উৎপাদন ইত্যাদি কাজেও ব্যবহার করে। এবং জল পথে যাতায়াত ও মাল পরিবহনও করা হয়।

জলাভাব ঃ উপরিউক্ত কার্য্যের জন্য পূর্বে যত জলের প্রয়োজন হতো, বর্ত্তমানে দিন যাপনের মান ও জনসংখ্যা বৃদ্ধির জন্য পূর্বের চেয়ে অনেক বেশী জলের প্রয়োজন হচ্ছে। তাই ব্যবহার উপযোগী জলের চাহিদা ক্রমাগত বেড়ে চলেছে, কিন্তু চাহিদার তুলনায় যোগান কম হওয়ায় জলাভাব দেখা দিচ্ছে। তারসঙ্গে দূষণের মাত্রা বেড়ে যাওয়ায় এই পরিস্থিতিকে বাড়িয়ে তুলেছে।

পৃথিবীর দুর্ভিক্ষ প্রবণ অঞ্চলে থাকা আফ্রিকার অধিকাংশ অঞ্চল, পশ্চিম ও দক্ষিণ এশিয়া, আমেরিকাযুক্ত রাজ্যের কিছু পশ্চিমাঞ্চল, দক্ষিণ আমেরিকার কিছু অঞ্চল এবং সমগ্র অস্ট্রেলিয়া মহাদেশে জলাভাব এক সমস্যা রূপে দেখা দিয়েছে। সেই সব অঞ্চলের বার্ষিক ও ঋতুকালীন বৃষ্টিপাতের পার্থক্য জলাভাবের প্রধান কারণ।

তোমরা জানো কি ?

লাগাতার দুঘন্টা বৃষ্টি হলে, সাধারণ ছাতের ওপর ৪০০ লিটার জল দাঁড়ায় যদি সেই জল নলের দ্বারা কোনো নির্দিষ্ট স্থানে জমিয়ে জলাভাবের সময় ব্যাবহার করাকে বৃষ্টির জল সংগ্রহ প্রকল্প বলা হয়।

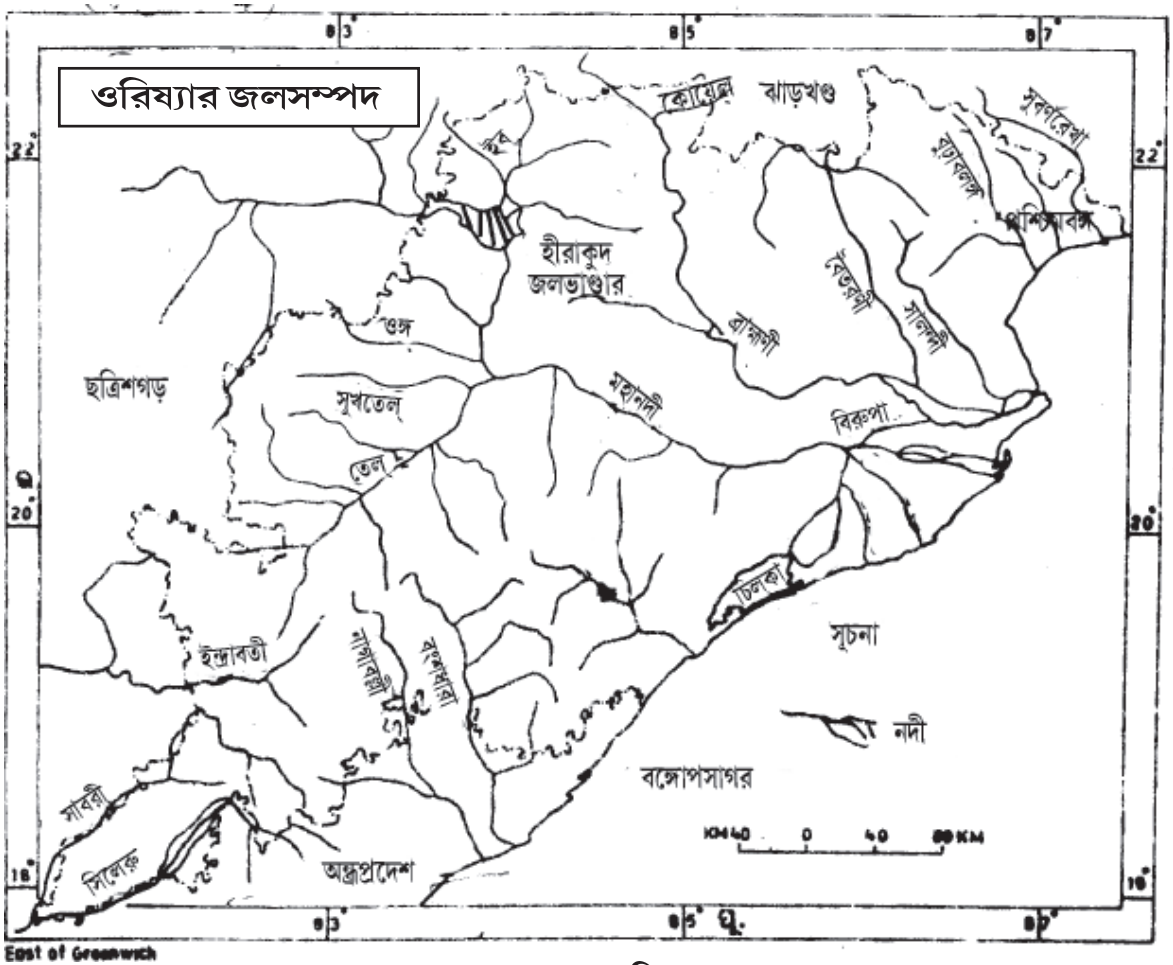

মানচিত্র

জল সংরক্ষণ ঃ

মানুষের ব্যবহার উপযোগী জলের অভাব এখন পৃথিবীর এক উৎকৃষ্ট সমস্যা। জলাভাব থেকে রক্ষা পেতে হলে দ্রুত ক্ষয় হয়ে যাওয়া এই অমূল্য সম্পদ সংরক্ষণ অতি জরুরী। জল নবীকরণ যোগ্য সম্পদ হলেও দূষণের জন্য ব্যবহার উপযোগী জলের পরিমাণ হ্রাস পাচ্ছে। সেইজন্য বারম্বার ব্যবহৃত হয়ে অপরিষ্কার হওয়া জল, শিল্পের, ডাক্তারখানায়, শহরাঞ্চলের নালাতে এবং কৃষিতে রাসায়নিক মিশ্রিত জল পরিষ্কার না করে, প্রবাহ মান জলে ছেড়ে দেওয়া অনুচিত। মৃত ব্যক্তি ও প্রাণীর শবনদী নালা ইত্যাদি প্রবাহমান জলে ফেলা উচিত নয়। জল সংগ্রহ প্রকল্প দ্বারা বৃষ্টির জল জমিয়ে শুখার সময় ব্যবহার করা আবশ্যক। যথেষ্ট বনানীর দ্বারা উদ্ভিদ আচ্ছাদন করে বৃষ্টির জলের গতি মন্থর করে ভূগর্ভের জলের অনাবশ্যক ব্যবহার নিয়ন্ত্রণ করে জলের সঞ্চয় বাড়ানো উচিত।

ব্যবহার	প্রত্যেক শহুরে ব্যক্তির প্রতি দিনের জল
পানীয়	৩ লিটার
রন্ধন	৪ লিটার
স্নান	২০ লিটার
শৌচ	৪০ লিটার
পোষাক সাফাই	৪০ লিটার
বাসন ধোওয়া	২০ লিটার
উদ্যান	২৩ লিটার
মোট	১৫০ লিটার

জলের এই ব্যবহার পরিমাণ হ্রাস করার উপায় তুমি বলতে পারবে কি?

জল সংগ্রহ প্রবন্ধের দ্বারা শুষ্ক ঋতুতে ব্যবহার করার জন্যে বৃষ্টির জল ধরে রাখা উচিত। ফোঁটা ফোটা জলসেচন ও সিঞ্চন সেচনের দ্বারা সেচে ব্যবহৃত জলের পরিমাণ হ্রাস করা জরুরী। শুষ্ক অঞ্চলে সেচিত জল যেন শীঘ্র শুকিয়ে না যায় তার জন্য সতর্কতা জরুরী। কৃষিক্ষেত্রে সেচিত জল যাতে আল ভেঙ্গে বেরিয়ে না যায় তার ব্যবস্থা করা দরকার। নদীতে ব্যারেজ, আনীকট ও বাধ দিয়ে বর্ষাকালের বিপুল জলরাশি নদী হয়ে যাতে সমুদ্রে মিশে না যায় এবং সময়োচিত উচিৎ ব্যবহার এবং আবশ্যকতার গুরুত্ব জনসাধারণের মধ্যে সচেতনতা বৃদ্ধি করা দরকার।

তুমি জানো কি?

অনিকট নদীর দুইতীরকে বেঁধে ছোট ছোট গর্ত্ত থাকা ২ মিটার উঁচু হয়ে ছোট্ট জলাধার তৈরী করে রাখে বেশী বৃষ্টি হলে ওপর দিয়ে জল বয়ে যায়। এর দুপাশে থাকা ক্যানেল দিয়ে চাষের জমিতে জল সেচন হয়।

ব্যারেজ ঃ অনিকটের চেয়েবেশী উঁচু লৌহ ফলক দিয়ে তৈরী হয় ও বড় এবং গভীর জলাধার তৈরী করে রাখে এবং সারা বছর সেচের জল যোগায়।

ড্যাম ঃ নদীর উভয়তীর সংযোগ করা কংক্রিট ও মাটির বাঁধকে ড্যাম বলা হয়। বড় হওয়ার ফলে বিশাল জলাধার সৃষ্টি হয় এবং বিদ্যুৎ উৎপাদন। বন্যা নিয়ন্ত্রণ প্রভৃতি বিভিন্ন উদ্দেশ্য সাধন করে।

ব্যারেজ ও ড্যামের ওপর সড়ক পথ থাকে। কিন্তু অনিকটে তা থাকে না।

প্রাকৃতিক উদ্ভিদ ও বন্য প্রাণী

আরতি গ্রামে থাকার সময় গ্রামের মেয়েদের রঙ করা তালপাতার পাখা, ব্যাগ চাটাই ইত্যাদি করতে দেখেছিল। ওর মনেও সেইরকম হস্তশিল্প বস্তু তৈরীর আগ্রহ হয়েছিল। একদিন ওর বাবাকে বলল বাবা আমাদের স্যার বলছিলেন ভুবনেশ্বরে হস্তশিল্প প্রদর্শনী হচ্ছে। আমাকে সেই প্রদর্শনী দেখাতে নিয়ে যাবে? বাবা ওর আগ্রহ দেখে রবিবার দিন প্রদর্শনী দেখতে নিয়ে গেল। প্রদর্শনীতে অনেক মণ্ডপ ছিল। প্রত্যেক মণ্ডপে ভিন্ন ভিন্ন শিল্প সামগ্রী দেখে আরতি ওর বাবাকে বলল ''বাবা এতো সুন্দর সুন্দর জিনিষ কি দিয়ে তৈরী হয়েছে আর কোথা থেকে এসেছে? বাবা বললেন — এসব আমাদের দেশ ও রাজ্যের জঙ্গলের গাছ থেকে সংগ্রহ করা কাঠ, বাঁশ, বেত, শিং, প্রাণীদের কাছ থেকে সংগ্রহ করা পালক ও চামড়া ইত্যাদি দিয়ে তৈরী হয়ে এখানে এসেছে।

তুমি জানো কি?

জৈব মণ্ডলে থাকা সমস্ত উদ্ভিদ ও প্রাণী বেঁচে থাকার জন্যে পরস্পরের সঙ্গে সম্পৃক্ত ও নির্ভরশীল। একে বলা হয় পরিসংস্থা।

মানব সাহায্য বিনা নিজেই সৃষ্টি হয়ে বেড়ে ওঠা লতা, বৃক্ষ ঘাস ইত্যাদিকে প্রাকৃতিক উদ্ভিদ বলা হয়। অশ্বমণ্ডল, বারিমণ্ডল ও বায়ুমণ্ডল এর মিলনস্থলে থাকা সংকীর্ণ অঞ্চল, যেখানে প্রাকৃতিক উদ্ভিদ ও বণ্য প্রাণীরা থাকে, তাকে জৈব মণ্ডল বলা হয়। প্রাকৃতিক উদ্ভিদ ও বণ্যপ্রাণী অতি মূল্যবান সম্পদ।

জৈব মণ্ডল সুরক্ষিত থাকলে প্রাকৃতিক উদ্ভিদ ও বণ্য প্রাণীদের বংশ বৃদ্ধি ও সহ অবস্থানে উন্নতি হয়। এর দ্বারা পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষা হয়।

ব্যবহার ঃ

প্রাকৃতিক উদ্ভিদ মানুষকে বিভিন্ন ভাবে সাহায্য করে। বৃক্ষ মানুষকে কাঠ ও নিশ্বসের অম্লজান যোগায়। প্রাণীদের আশ্রয় দেয়। ফসল উৎপন্নের প্রয়োজনীয় মাটি, অবক্ষয়ের হাত থেকে রক্ষা করে ও ভূতলে জল সঞ্চয়ে সাহায্য করে। অরণ্যে থাকা বৃক্ষলতা থেকে ফল বীজ, আঠা, কাঠ ঔষধি পত্র পাই। এমনকি লেখার পড়ার কাগজ ও পাই। এতদ ব্যাতীত উদ্ভিদ আমাদের বিভিন্ন প্রয়োজনে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ সাহায্য করে।

তুমি জানো কি? ভারতে দেখতে পাওয়া শকুন, মৃত প্রাণীর শব খেয়ে পরিবেশ দূষনরোধ করে থাকে। শরীরে ব্যথা কমানোর ওষুধ ডাইক্লোফেনাক প্রয়োগ হওয়া পশুদের শব ভক্ষন করে ওদের মুত্রাশয় ক্ষতি জনিত রোগাক্রান্ত হয়ে ওরা নির্বংশ হয়ে যাচ্ছে।

বণ্য প্রাণী ঃ

পশু পক্ষী, কীট পতঙ্গ, এমনকি জলচর জীবকেও বণ্যপ্রাণী বলা হয়। এদের কাছ থেকে আমরা মাংস, দুধ, চামড়া, পশম ইত্যাদি পাই। মৌমাছির চাক থেকে মধু পাই। এরা ফুলে পরাগ সঙ্গম করিয়ে থাকে। বিভিন্ন প্রকার কীট পতঙ্গ পরিবেশের ময়লা পচিয়ে গলিয়ে সাফ করে দেয়। কাক শকুন পশু পক্ষীর শব খেয়ে পরিবেশ পরিচ্ছন্ন রাখে। ছোট থেকে বড় সবাই মিলে মিলিত ভাবে পরিবেশের পরিচ্ছন্নতা রক্ষা করে।

বিতরণ (উদ্ভিদ) ঃ

উদ্ভিদের বৃদ্ধি প্রধানতঃ আলোক, উত্তাপ ও আদ্রতার ওপর নির্ভর করে। এগুলো বিচার করে পৃথিবীর বিভিন্ন অঞ্চলের উদ্ভিদকে চার শ্রেণীতে ভাগ করা হয়। যথাঃ অরণ্য, ঘাস জমি, কাঁটা ঝোপ ও তুন্দ্রা। বেশী বৃষ্টিপাত অঞ্চলে বৃক্ষরা ঘন হয়ে বাড়ে। বৃষ্টিপাতের পরিমাণ কমা অনুসারে তাদের আকার ও ঘনত্ব কমে যায়। বিশ্বের মধ্যম বৃষ্টিপাত অঞ্চলে ছোট ছোট গাছ ও তৃণভূমি দেখা যায়। অল্প বৃষ্টিপাত অঞ্চলে নিকৃষ্ট বৃক্ষ ও কাঁটা ঝোপ দেখা যায়। এদের শিকড় জল আহরণের জন্য মাটি গভীরে প্রবেশ করে। অধিক জলীয় বাষ্প মোচন থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্যে পাতা মোটা কাঁটাযুক্ত ও চকচকে হয়। মেরু অঞ্চলে শ্যাওলা ও হিমগুল্ম প্রধান উদ্ভিদ। একে তুন্দ্রা বলে। বরফাবৃত পাহাড় শিখরে তুন্দ্রা উদ্ভিদ জন্মায়। পাতা ঝরার বিচারে জঙ্গল দুভাগে বিভক্ত যথা ঃ চিরহরিৎ ও পর্ণমোচী। চিরহরিৎ বৃক্ষ অধিক বৃষ্টিপাত অঞ্চলে থাকার জন্য জলাভাব শূণ্য হয় ও এদের পাতা সর্বদা সবুজ হয়ে থাকে। এরা কোনো নির্দিষ্ট সময়ে এককালীন পাতা ঝরায় না। পর্ণমোচী বৃক্ষেরা বছরের এক নির্দিষ্ট সময়ে অর্থাৎ শুষ্ক ঋতুতে সব পাতা একসঙ্গে ঝরিয়ে দেয়, এর ফলে ওরা বাষ্প বিমোচন করে অধিক জলক্ষয় থেকে নিজেদের রক্ষা করে। অরণ্য যে অঞ্চলে অবস্থিত, সেই অঞ্চলের অক্ষাংশর হিসেবে অরণ্যকে তিন শ্রেণীতে বিভক্ত করা হয়, যেমন ঃ নিরক্ষীয় অরণ্য, ক্রান্তীয় অরণ্য ও নাতিশীতোষ্ণ অরণ্য।

নিরক্ষীয় অরণ্য ঃ বিষুব রেখার উভয় পার্শ্বে ৫° উত্তর ও ৫° দক্ষিণ অক্ষাংশর মধ্যে উত্তাপ ও জলের প্রাচুর্য্য হেতু শক্ত কাষ্ট বিশিষ্ট ঘন ও চিরসবুজ বৃক্ষ দেখা যায়। তাকে নিরক্ষীয় অরণ্য বলা হয়। দক্ষিণ আমেরিকার আমাজন অববাহিকা। আফ্রিকার কঙ্গো অববাহিকা, ও ভারতের পশ্চিম অংশের পশ্চিম ঘাট পর্ব্বতমালায় এ ধরণের অরণ্য দেখতে পাওয়া যায়। এই অরণ্যে মেহগিনি, আবলুস, রবার প্রভৃতি বৃক্ষ জন্মায়।

ক্রান্তীয় অরণ্য ঃ এর উভয় পার্শ্বে ৫°- ২৫° উত্তর ও ৫° - ২৫° দক্ষিণ অক্ষাংশের মধ্যে অবস্থিত অঞ্চলে মৌসুমী বর্ষার কারণে একে মৌসুমী অরণ্যও বলা হয়। এই অরণ্যে বছরের এক নির্দিষ্ট সময়ে পাতা ঝরা দেয় বলে একে পর্ণমোচী অরণ্যও বলা হয় দক্ষিণ পূর্ব এশিয়া, উত্তর অস্ট্রেলিয়া পূর্ব আফ্রিকা ও পূর্ব ব্রাজিল, এবং পশ্চিম ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জে এই প্রকার অরণ্য দেখতে পাওয়া যায়। ভারতের পূর্বাঞ্চল, পূর্বঘাট পর্বতের পূর্বাংশ ছোটনাগপুরের মালভূমি, ওড়িশা, ছত্তিশগড় ও মধ্য প্রদেশের পার্বত্য অঞ্চলে এরূপ অরণ্য দেখা যায়। এই অরণ্যে শাল, পিয়াশাল, শিশু ইত্যাদি বৃক্ষ দেখতে পাওয়া যায়। নাতিশীতোষ্ণ অরণ্য ঃ উভয় গোলার্ধে ২৫° থেকে ৬৫° অক্ষাংশের মধ্যে থাকা অরণ্যকে বলা হয়। একে দুভাগে বিভক্ত করা হয়েছে। যথা উষ্ণ ও শীতল নাতিশীতোষ্ণ অরণ্য। উষ্ণ নাতিশীতোষ্ণ অরণ্য ক্রান্তিয় অরণ্যের লাগোয়া হয়। এই অরণ্যে লম্বা, তৈলাক্ত পত্র, ও মোটা বল্ক যুক্ত

অলিভ ও ওক বৃক্ষ জন্মায়, মহাদেশগুলির পূর্ব ও পশ্চিম উপকূলে এবং ভূমধ্যসাগরীয় দেশে প্রধানতঃ এই অরণ্য দেখা যায়। শীতল নাতিশীতোষ্ণ অরণ্য তুন্দ্রা অঞ্চলের কাছে থাকে। এই অরণ্যের বৃক্ষরা সরল, নরম কাষ্ঠ যুক্ত ও পাইন শ্রেণীর হয়। সাইবেরিয়া, স্ক্যান্ডিনেভিয়া, কানাডার উত্তর অঞ্চল ও ভারতের হিমালয়ের উচ্চাংশের এই অরণ্য দেখতে পাওয়া যায়। এখানে পাইন, ফার ইত্যাদি বৃক্ষ দেখা যায়।

ওড়িশায় ৩২ শতাংশ ভূমিতে অরণ্য দেখা যায়। এগুলিকে প্রধানত চার ভাগে বিভক্ত করা হয়েছে। যথাঃ ক্রান্তীয় অধা চিরহরিত, ক্রান্তীয় আদ্র পর্ণমোচী, ক্রান্তীয় শুষ্ক পর্ণমোচী ও উপকূলবর্তী জোয়ার অরণ্য। ক্রান্তীয় আদ্র পর্ণমোচী অরণ্য মোট অরণ্যের প্রায় ৮০ ভাগ হয়। বন্য জন্তুর বিভাজন ঃ জঙ্গল ঃ জঙ্গলে মুক্ত হয়ে বিচরণ করা কীট পতঙ্গ পশু পক্ষী ও সরিসৃপদের বণ্যপ্রাণী বলা হয়। আহারের বিচারে এদের তিন ভাগে ভাগ করা হয় যথাঃ তৃণভোজী, মাংসাশী ও উভয়ভোজী তৃণভোজী যথা হাতি, জিরাফ, সম্বর, হরিণ, জেব্রা প্রভৃতি। নিজের খাদ্যের জন্য উদ্ভিদের ওপর নির্ভর করে। মাংসাশী প্রাণী যথা বাঘ, সিংহ গুল বাঘ চিতা, প্রভৃতিরা তৃণভোজী প্রাণীদের মেরে খাদ্য খায়। উভয়ভোজী যথা শিয়াল ভাল্লুক রা উভয় খাদ্যই গ্রহণ করে। মোটের উপর সমস্ত বন্য প্রাণী বেঁচে থাকার জন্যে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ ভাবে জঙ্গলের ওপরে নির্ভরশীল হওয়ার ফলে তারা নিবিড় ভাবে অরণ্যের সঙ্গে সম্পৃক্ত থাকে।

ভূপ্রকৃতি ও জলবায়ু অনুসারে পৃথিবীর বিভিন্ন অঞ্চলে ভিন্ন ভিন্ন ধরণের অরণ্য দেখা যায়, ফলে সেখানে বিভিন্ন ধরণের বন্য প্রানী দেখতে পাওয়া যায়।

আফ্রিকার কঙ্গো অববাহিকা ও দক্ষিণ আমেরিকার আমাজন অঞ্চলে জঙ্গল খুব ঘন ও ভূমি স্যাতসেতে হওয়ায়, সেখানে সাপ, কুমীর বিভিন্ন সরিসৃপ ও গাছের ডালে লাফাতে সক্ষম, বাঁদর, শিম্পাঞ্জী, ওরাংওটাং ইত্যাদি বাস করে। গ্রীষ্মমন্ডলীয় তৃণভূমি, যেমন - আফ্রিকা মহাদেশের সাভানা অঞ্চলে হরিণ, জেব্রা জিরাফ বুনো ঘোড়া প্রভৃতি তৃণভোজী প্রাণী ও সিংহ, চিতা, হায়না প্রভৃতি মাংসাশী প্রাণী বহু পরিমাণে বাস করে। প্রেইরী ও স্টেপ প্রভৃতি নাতিশীতোষ্ণ তৃণভূমিতে ঘাস ছোট নরম হওয়ায় সেখানে ভেড়া ও ঘোড়া বেশী দেখতে পাওয়া যায়। সাহারা ও আরবের গ্রীষ্ম মণ্ডলীয় মরুভূমিতে উট প্রধান জীব। কারণ উট অল্প জল খেয়ে অনেক দিন থাকতে পারে। আফ্রিকার কালাহরি মরুভূমিতে উট পাখি, অস্ট্রেলিয়ার মরুভূমিতে এমু ও ক্যাঙ্গারু প্রধান প্রাণী। আন্টার্কটিকা বরফাবৃত অঞ্চলে পেঙ্গুইন নামক পাখি বাস করে। উত্তর মেরু অঞ্চলে সিল-সাদা ভাল্লুক ও সিলভার ফক্স প্রভৃতি নরম লোমশ প্রাণী বাস করে। পরিবেশও ভৌগলিক স্থিতির বিভিন্নতায় ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলের অরণ্যের বিভিন্ন প্রকার প্রাণী বাস করে যথা ঃ হাতি, বাঘ, সিংহ, গন্ডার, ভাল্লুক, গয়াল, হরিণ বরাহ প্রভৃতি প্রধান।

কৃষ্ণসার হরিণ

সুন্দরবন বাঘের জন্য বিখ্যাত। ভারত-নেপাল সীমান্ত অঞ্চলে কস্তুরী মৃগ, চমরী গাই দেখা যায়। ভারতের জঙ্গলে কেউটে গোখরো, চন্দ্রবোড়া প্রভৃতি বিষধর সর্প ও অজগর, ময়াল প্রভৃতি নির্বিষ অতিকায় সাপ দেখা যায়। জলে কুমীর, গোসাপ, জলহস্তী প্রভৃতি দেখা যায়। প্রায় দেশের সব জঙ্গলে ময়ূর, টিয়া, চন্দনা পাখি এবং জলভাগে হাঁস, রাজহাঁস, সারস, পানকৌড়ি প্রভৃতি পাখি দেখতে পাওয়া যায়। ময়ূর ভারতের জাতীয় পক্ষী ও বাঘ ভারতের জাতীয় পশু।

অজগর

ওড়িষ্যার জঙ্গলে হাতি, বাঘ ও চিতাবাঘ দেখা যায়। অনুগুল, সম্বলপুর কোরাপুট ইত্যাদি জেলায় জঙ্গলে নীলগাই, চতুশিঙ্গা হরিণ এবং মালকানগিরি ও খড়িয়াল জঙ্গলে বুনো মোষের দেখা পাওয়া যায়। ওরিষ্যার প্রায় সব জঙ্গলে, হরিণ, সম্বর, কুটরা, বরাহ, ভাল্লুক প্রভৃতি প্রাণী ও ময়ূর, কুবো, টিয়া, চন্দনা, সজারু ইত্যাদি পক্ষী দেখা যায়। ওড়িষ্যার নদী ও হ্রদে পানকৌড়ি, হাঁস, বক, কাদাখোঁচা প্রভৃতি নানা জাতের পাখি ও কুমীর হাঙর, কচ্ছপ প্রভৃতি প্রাণী দেখতে পাওয়া যায়। চিলিকা হ্রদে ডলফিন দেখা যায় এবং তা দেখতে অনেক পর্যটক আসে।

প্রাকৃতিক উদ্বিদের সংরক্ষণ ঃ দুই শত বৎসর পূর্বে পৃথিবীর জনসংখ্যা যাছিল, বর্তমানে তার চেয়ে অনেক বেশী লোক পৃথিবীতে বাস করছে। তাদের খাদ্য ও বাসস্থানের প্রয়োজন মেটাতে অনেক স্থানের প্রয়োজনে, বিস্তৃত জঙ্গল পরিষ্কার করে কৃষি ও বাস ভূমিতে পরিণত করা হয়েছে। ফলে জঙ্গলের আয়তন প্রতিদিন হ্রাস পাচ্ছে। এর ফলে পৃথিবীর সব অঞ্চলে জঙ্গললের অবক্ষয় ঘটে পরিবেশের ভার সাম্য নষ্ট হচ্ছে। এই কারণে জঙ্গলকে ধ্বংসের হাত থেকে রক্ষা করা অতি আবশ্যক হয়ে পড়েছে।

অরণ্য মানব সমাজের অমূল্য সম্পদ হলেও বর্ত্তমানে জলবায়ুর পরিবর্ত্তন ও মানুষের হস্তক্ষেপে নষ্ট হয়ে যাওয়ায় অনেক প্রজাতির উদ্ভিদ ও প্রাণী অসুরক্ষিত অবস্থায় আছে। তাদের বিলোপ ও

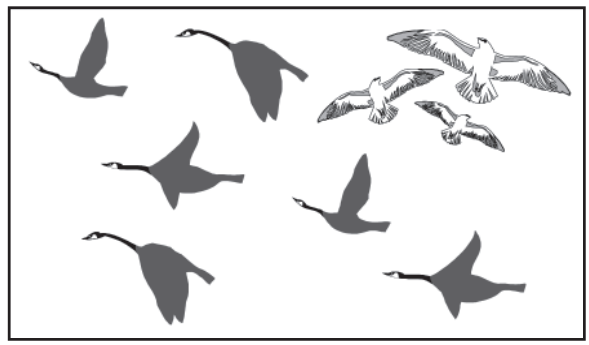

পক্ষীঅভয়ারণ্য

বিপদগ্রস্ত হওয়ার কারণগুলির মধ্যে অরণ্যক্ষয়, মৃত্তিকার ক্ষয়, নির্মাণ শিল্প বনাগ্নি, সামুদ্রিক ঝড় ও ভূস্বলন প্রভৃতি প্রাকৃতিক ও মানবিক কারণ সমূহ উল্লেখযোগ্য।

নিম্নলিখিত পন্থা অবলম্বন করে এসব কার্য্যের নিবারণ সম্ভব হলে উদ্ভিদ সংরক্ষণ করা সম্ভব।

ক) যথেচ্ছ জঙ্গল কাটা বন্ধ করা কারণ নতুন জঙ্গ ল সমপরিমাণে সৃষ্টি করা অসম্ভব।

খ) পাহাড়ি অঞ্চলে পোড়ু চাষের মত স্থানান্তরিত চাষ বন্ধ করতে হবে।

গ) নিয়ন্ত্রণহীন পশুচারণ বন্ধ করা দরকার।

ঘ) সামাজিক বন সৃজন, পথপার্শ্বে বৃক্ষ রোপন, উপকূলে বনসৃজন ও বন মহোৎসব প্রভৃতি কার্য্যের দ্বারা উন্নতি করা সম্ভব।

মনে রেখো ঃ

অভয়ারণ্য অপেক্ষা জাতীয় উদ্যানে, পশুপক্ষীদের সুরক্ষার প্রতিবেশী যত্ন নেওয়া হয়।

বন্যজন্তু সংরক্ষণ ঃ

অধুনা ব্যাপক হারে ডিম খাদ্য, রূপে ব্যবহৃত হওয়ার ফলে, মুর্গি ও হাঁসের বংশ বৃদ্ধি কমে যাচ্ছে। ময়ূরের পালক অতি লোভনীয়। ফলে ব্যপক হারে ময়ূর হত্যা করা হচ্ছে।

বিভিন্ন বন্য জন্তুদের মাংস, চামড়া, দাঁত, শিঙ প্রভৃতির জন্য হত্যা করা হচ্ছে।

এই ধরণের কার্য্য কলাপ বন্ধ করতে জনসচেতনা বৃদ্ধি করে এদের সংরক্ষণ করা যেতে পারে।

তুমি জানো কি ? ঃ

নিজের বিদ্যালয়ে ও বাড়ির বাগানে প্রতি বছর অন্ততঃ একটা করে গাছ লাগালে এবং যত্ন করলে পরিবেশ উপকৃত হবে।

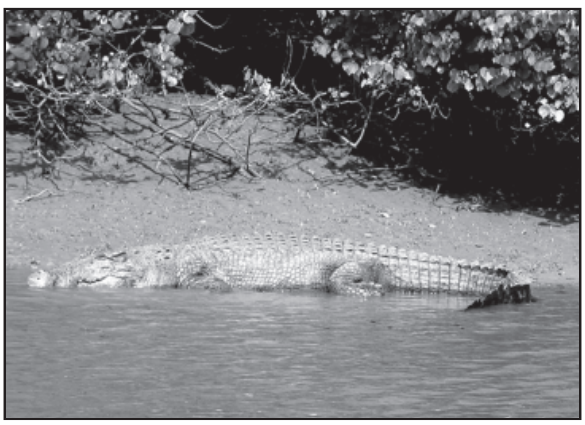

(ভিতর কনিকা কুমীর প্রকল্প)

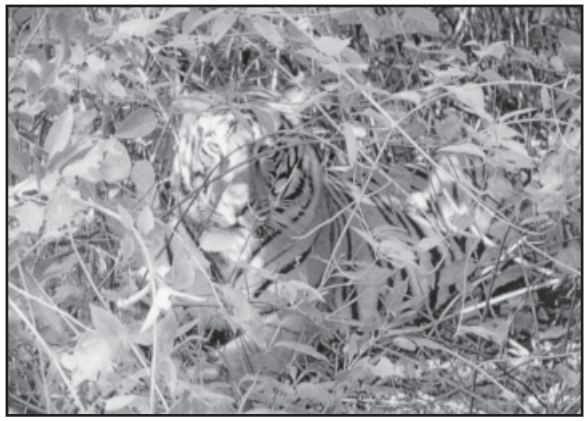

(শিমলিকাল ব্যাঘ্র প্রকল্প)

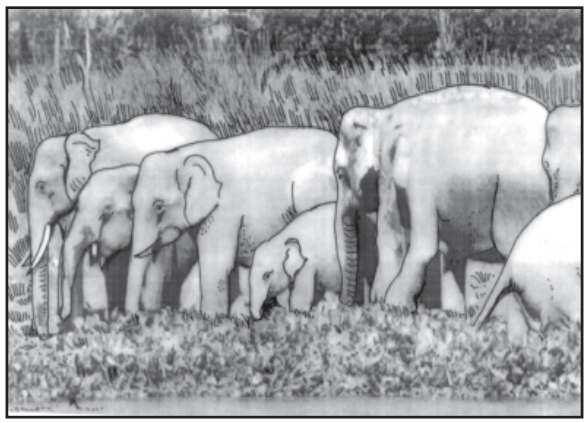

(চন্দকার হাতী অভয়ারণ্য)

জাতীয় উদ্যান, বন্যজন্তু সুরক্ষা, অভয়ারণ্য জৈব মণ্ডল সুরক্ষা প্রভৃতি গঠন করা হলে বন্য প্রাণীরা সুরক্ষিত থাকবে এবং বংশ বৃদ্ধি করতে পারবে। এদের সুরক্ষার জন্যে আমাদের দেশে ১৯৭২ সালে বন্যপ্রাণী বোর্ড গঠিত হয়েছে। দেশের বিভিন্ন স্থানে কয়েকটি অভয়ারণ্য, জাতীয় উদ্যান, ব্যাঘ্র প্রকল্প, কুমীর প্রকল্প ও পক্ষী বিহার প্রকল্প ইত্যাদি স্থাপন করা হয়েছে। এর ফলে বন্য প্রাণীরা সুরক্ষিত প্রাকৃতিক পরিবেশ প্রাপ্ত করে তাদের বংশ বৃদ্ধি করতে পারছে।

ভারতের কয়েকটি অভয়ারণ্য ঃ

অভয়ারণ্য	রাজ্য ও স্থান
ব্যাঘ্র প্রকল্প	আসামের মানস, পশ্চিমবঙ্গের সুন্দরবন, ঝাড়খন্ডের পালামু, উত্তরাখন্ডের করবেট জাতীয় উদ্যান, মহারাস্ট্রের মে ঘাট, ওড়িশার শিমলিপাল কর্নাটকের বাঁদিপুরা ইত্যাদি।
একশিঙা গন্ডার ঃ	আসামের জোড়হাটের অন্তর্গত কাজিরাঙা জাতীয় উদ্যান।
সিংহ ঃ	গুজরাটের সৌরাস্টের কাছে গির্ জাতীয় উদ্যান।
বিভিন্ন পক্ষী ঃ	রাজস্থানের ভবতপুর। ওড়িশার কয়েকটি অভয়ারণ্য।
বাঘ ঃ	ময়ূরভঞ্জ জেলার শিমলি পাল
হাতী ঃ	ভুবনেশ্বরের কাছে চন্দকা জঙ্গল।
কুমীর প্রকল্প ঃ	অনুগুল জেলার নিকট টিকরপাড়ার সাতকোশিয়া এবং কেন্দ্রাপাড়ার ভিতর কনিকা বিদ্যমান।
পক্ষী বিহার ঃ	চিলিকা হ্রদ।

এতদ ব্যাতীত, বনসৃজন, বনমহোৎসব প্রভৃতি গোষ্ঠিবদ্ধ সচেতনা শিবির আয়োজন করে তাতে যুবশক্তি ও ছাত্রছাত্রীদের সংশ্লিষ্ট করার দ্বারা জৈব সংরক্ষণের প্রতি জনগণের মনে অধিক আগ্রহের সৃষ্টি করা হচ্ছে। এবং অতি স্বল্প পরিমাণে হলেও কিছুটা উন্নতি পরিলক্ষিত হচ্ছে। এটা একটা ভালো লক্ষ্মণ।

খনিজ সম্পদ ঃ

(খনিক) হরি মামার সঙ্গে মামার বাড়ী যাবার সময় ওদের বাস চন্ডীখোলের কাছে ভিড়ের জন্য আটকে ছিল। পাঁচ নম্বর জাতীয় সড়কে শয়ে শয়ে ট্রাক মাল বোঝাই করে যেতে দেখে হরিমামাকে বলল মামা এত ট্রাক কি নিয়ে কোথায় যাচ্ছে? মামা বললো এই ট্রাকগুলো দৈতারি খনি থেকে খনিজ পদার্থ নিয়ে পারাদ্বীপ বন্দরে যাচ্ছে। হরি বলল মামা খনিজ পদার্থ কাকে বলে? মামা উত্তর দিলেন খনিজ এক মৌলিক পদার্থ। ভূপৃষ্ঠের শিলা পাথর বিভিন্ন প্রকার খনিজ পদার্থ নিয়ে গঠিত। আমরা শিলার ভেতরে থাকা বিভিন্ন খনিজ দ্রব্যকে আলাদা ভাবে দেখতে পাই না। পৃথিবীর পাথুরে স্থানে খনিজ বিক্ষিপ্ত ভাবে থাকে।

তুমি জানো কি?

তোমার খাদ্যের নুন ও পেন্সিলের শিষ (গ্রাফাইট) ও খনিজ দ্রব্য

মানুষের বিনা সহায়তায় প্রাকৃতিক ভাবে সৃষ্ট নির্দিষ্ট রাসায়নিক মিশ্রণ যুক্ত পদার্থকে খনিজ দ্রব্য বলা হয়। খনি সর্বত্র সমান ভাবে থাকে না। বিশেষ নির্দিষ্ট অঞ্চলে সেসব কেন্দ্রীভূত হয়। কিছু খনি অগম্য স্থান যথা সুমেরু, কুমেরু, সমুদ্র পত্তন প্রভৃতি স্থানে রয়েছে। খনিগুলো তাদের ভৌতিক গুণ যথা মিলিয়ে যাওয়া গুণের ফলে চেনা যায়। পৃথিবীর অনেক অঞ্চলে শিলার সঙ্গে খনিজ পদার্থ মিশে রয়েছে। যে শিলায় খনিজ পদার্থ মিশে থাকে তাকে খনিজ পিন্ড বলা হয়। শিলার ভেতরে যে খনিজ পদার্থর আধিক্য থাকে তাকে সেই নামে নামাঙ্কিত করা হয়। পৃথিবীতে প্রায় ২৮০০ প্রকার খনিজ চিহ্নিত হলেও শুধু ১০০ প্রকার খনিজ, খনিজ পিন্ডতে বেশী পরিমাণে দেখা যায়।

পৃথিবীর কোনো অঞ্চলের খনিজ পিন্ডে যে খনিজ বেশী মাত্রায় থাকে, কেবল সেই অঞ্চলেই সংগ্রহ করে ব্যবহার করা হয়।

তুমি কি জানো কি?

শিলা এক বা একাধিক খনিজের সংমিশ্রন। শিলায় মিশ্রিত খনিজের নির্দিষ্ট অনুপাত থাকে না। যে শিলা থেকে খনিজ নিস্কাশন হয় তাকে বলে খনিজপিন্ড।

মনেরাখো ঃ সব খনিজই শিলা, কিন্তু সব শিলা খনিজ নয়।

খনিজের প্রকার ভেদঃ সৃষ্টির বিচারে খনিজকে দুভাগে বিভক্ত করা হয় ঃ জৈব ও অজৈব খনিজ। লোহা সোনা, তামা ইত্যাদি অজৈব পদার্থ থেকে সৃষ্টি হয় বলে তাদের অজৈব খনিজ ও কয়লা খনিজ তৈল প্রাকৃতিক গ্যাস প্রভৃতি জৈব বস্তু থেকে সৃষ্টি হয় বলে সেগুলি জৈব খনিজ এবং জীবাশ্ম ইন্ধন (Fossil Fuel) ও বলা হয়। উপাদনের নিরীখে খনিক (খনিজ) কে দুভাগে ভাগ করা হয়, যথা ধাতব ও অধাতব।

খনিক (খনিজ)
(Mineral)

ধাতব (Metalic) — অধাতব (Non Metalic)

লৌহযুক্ত (Ferrous) — লৌহ বিহীন (Non Ferrous)

যে খনিকে ধাতু থাকে তাকে ধাতব খনিক বলা হয়। যেমন ঃ লৌহপিন্ড, বক্সাইট, ম্যাঙ্গানিজ প্রভৃতি।

ধাতব খনিক দুইভাগে বিভক্ত। যথাঃ লৌহযুক্ত ও লৌহ বিহীন। লোহা, ম্যাঙ্গানীজ, ক্রোমাইট ইত্যাদি লৌহযুক্ত ধাতব খনিক। লোহা না থাকা খনিক পিন্ডকে লৌহ বিহীন খনিক বলা হয়। যথাঃ সোনা, রূপো, তামা সীসে প্রভৃতি।

ধাতু বিহীন খনিক পিন্ডকে অধাতব খনিক বলা হয়। যেমন অভ্র, চুনাপাথার, জিপসাম ইত্যাদি। কয়লা পেট্রোলিয়াম প্রভৃতি জ্বালানি খনিক ধাতু বিহীন হয় বলে তাদের অধাতব খনিক বলা হয়। (কেন?)

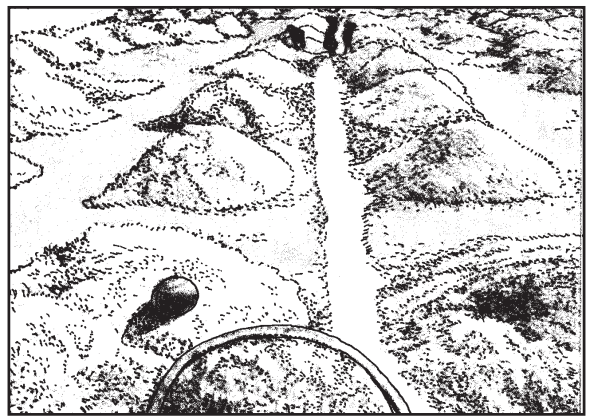

খনিজের (খনিকের) উত্তোলন ঃ পৃথিবীর ভূপৃষ্ঠে ও গভীর অন্তরে থাকা শিলা স্তরে গচ্ছিত খনিকের উত্তোলন প্রক্রিয়াকে খনি উত্তোলন (খনন) বলা হয়।

খনি খনন প্রক্রিয়াকে তিন ভাগে করা হয় যথাঃ সাধারণ খনন (Quarrging) খনি খনন (mining) এবং ড্রিলিং (Drilling).

খনিক উত্তোলন প্রক্রিয়া

সাধারণ খনন (Quarring)	খনি খনন (Mining)	ড্রিলিং (Drilling)
মুক্ত গর্ভ (খোলামুখ) (Opencast Mining)		গভীর খনন (Shaftming)

যেসব খনিক ওপরে দেখা যায় সেখানে সাধারণ ভাবে খুঁড়ে বেরকরাকে সাধারণ খনন বলা হয়।

যে খনিক ভুগর্ভের শিলার নীচে চাপা থাকে তাকে গভীর করে খুঁড়ে তোলাকে খনি খনন বলা হয়।

চিত্র - ২.১৭
(কয়লা উত্তোলন)

খনি খনন দুই প্রকার যথা ঃ মুক্ত গর্ভ (খোলামুখ) খনন ও গভীর খনন।

ভূপৃষ্ঠের স্বল্প গভীরে থাকা খনিক যে প্রক্রিয়া দ্বারা উত্তোলন করা হয় তাকে মুক্ত গর্ভ খনন বলা হয়। ভূগর্ভের গভীরতম স্থানে থাকা খনিক যে পদ্ধতিতে উত্তোলন করে নিয়ে আসা হয় তাকে গভীর খনন বলা হয়।

ড্রিলিং ঃ
ভূগর্ভের গভীরতম স্থানে থাকা পেট্রোলিয়াম পদার্থ ও প্রাকৃতিক গ্যাস নিষ্কাশন করার জন্য গভীর কূপ খনন পদ্ধতিকে ড্রিলিং বলা হয়।

খনিক পিন্ডকে ভূগর্ভ থেকে বের করে কারখানায় প্রেরণ করে তার থেকে খনিক কে বিশেষ কোনো আলাদা করার প্রক্রিয়াকে নিষ্কাশন ((Extraction) পদ্ধতি বলা হয়।

পৃথিবীর খনিকের বিতরণ ঃ পৃথিবীতে আগ্নেয় রূপান্তরিত ও স্তরীভূত শিলায় খনিক থাকে। ধাতব খনিক সাধারণতঃ আগ্নেয় ও রূপান্তরিত শিলায় গঠিত হওয়া মালভূমিতে দেখা যায়। উত্তর সুইডেনের মালভূমিতে থাকা লোহা, আন্টারিও এবং কানাডার মালভূমিতে গচ্ছিত নিকেল, দক্ষিন আফ্রিকার মালভূমিতে থাকা লোহা, নিকেল, ক্রোমাইট্ এবং প্ল্যাটিনাম এর প্রকৃষ্ট উদাহরণ। দক্ষিণ আফ্রিকার জোহান্স বার্গের সোনার খনি পৃথিবী বিখ্যাত।

সমতল ভূমি ও তরুন ভঙ্গুর পাহাড়ের স্তরযুক্ত শিলায় চুনা পাথরের মতো অধাতব খনিক দেখা যায়। ফ্রান্সের ককে শাস অঞ্চলের চুনা পাথর, ইউক্রেন অঞ্চলের জিপসাম্, ও আলজেরিয়ার ফসফেট্ এর উদাহরণ।

কয়লা ও পেট্রোলিয়ম এর মতো জ্বালানি খনিক ও স্তরীভূত শিলায় গচ্ছিত থাকে।

চিত্র - ২.১৮
(সমুদ্রর তলা থেকে তৈল উত্তোলন)

খনিক দ্রব্যের বিতরণ

খনিক দ্রব্য	ব্যবহার	পৃথিবীর দেশ	ভারতের রাজ্য	ওড়িশার জেলা
লোহা পাথর	লোহা ও ইস্পাত তৈরী হয়	আমেরিকা, রাশিয়া, ভারত, ব্রাজিল, চিন, কানাডা, অস্ট্রেলিয়া ইত্যাদি	ওড়িশা, ঝাড়খন্ড, ছত্তিশগড়, অন্ধ্র, মধ্যপ্রদেশ, গোয়ো, কর্নাটক	কেন্দুঝর, যাজপুর, ময়ুরভঞ্জ, সুন্দরগড়
ম্যাঙ্গানিজ	মিশ্রধাতু প্রস্তুত হয়	রাশিয়া, ব্রাজিল, ভারত, চীন, অস্ট্রেলিয়া ও দক্ষিণ আফ্রিকা প্রভৃতি	ওড়িশা, মধ্যপ্রদেশ, মহারাস্ট্র ও ঝাড়খন্ড	কেন্দুঝর, কালাহাণ্ডি, সুন্দরগড় বোলাঙ্গির ও কোরাপুট
ক্রোমাইট্	ইস্পাত ও চামড়া শিল্পে ব্যবহার হয়	দক্ষিণ আফ্রিকা ওড়িশা, অন্ধ্র, ভারত, রাশিয়া, কর্ণাটক, মহা ব্রাজিল প্রভৃতি। রাস্ট্র, ঝাড়খন্ড ও তামিলনাড়ু	ওড়িশা, অন্ধ্র, কর্ণাটক, মহারাস্ট্র, ঝাড়খন্ড ও তামিলনাড়ু	যাজপুর, কেন্দুঝর ঢেস্কানাল
বক্সাইট্	আলুমিনায়াম শিল্পে ব্যবহার হয়।	জামাইকা, ভারত, অস্ট্রেলিয়া চায়না, রাশিয়া, ব্রাজিল ইত্যাদি	ঝাড়খন্ড, ওড়িশা, গুজরাট, মধ্য প্রদেশ ও কর্ণাটক।	বরগড়, বলাঙ্গীর, কোরাপুট ও কালাহান্ডি
অভ্র	বৈদ্যুতিক শিল্পে ব্যবহার হয়	ভারত, রাশিয়া, যুক্তরাস্ট্র, কানাডা, নরওয়ে, দক্ষিণ, আফ্রিকা প্রভৃতি	বিহার, ঝাড়খন্ড, অন্ধ্রপ্রদেশ, ও রাজস্থান	বলাঙ্গীর, কালাহান্ডি ও সুন্দর গড়
কয়লা	তাপবিদ্যুৎ শক্তি উৎপন্ন করা ও জ্বালিনির ব্যবহার করা	রাশিয়া, চীন, যুক্তরাস্ট্র, ভারত, জার্মানী, যুক্ত রাজ্য, অস্ট্রেলিয়া প্রভৃতি।	ঝাড়খন্ড, ওড়িশা, পঃবঙ্গ, মধ্যপ্রদেশ, ছত্তিশগড়, অন্ধ্রপ্রদেশ ও মহারাস্ট্র	অনুগুল, ঝাড়সুগুড়া ও সুন্দরগড়
খনিজ তৈল	বিভিন্ন যানে ইন্ধন রূপে ব্যবহার হয়	সৌদি আরব, ইরাক, ইরান, কুয়েত, ভেনে, জুয়েলা, রুমানিয়া, আমেরিকা, ইন্দোনেশিয়া প্রভৃতি	আসাম, গুজরাট, মহারাস্ট্র	

পৃথিবীর মুখ্য খনিকের বিতরণ

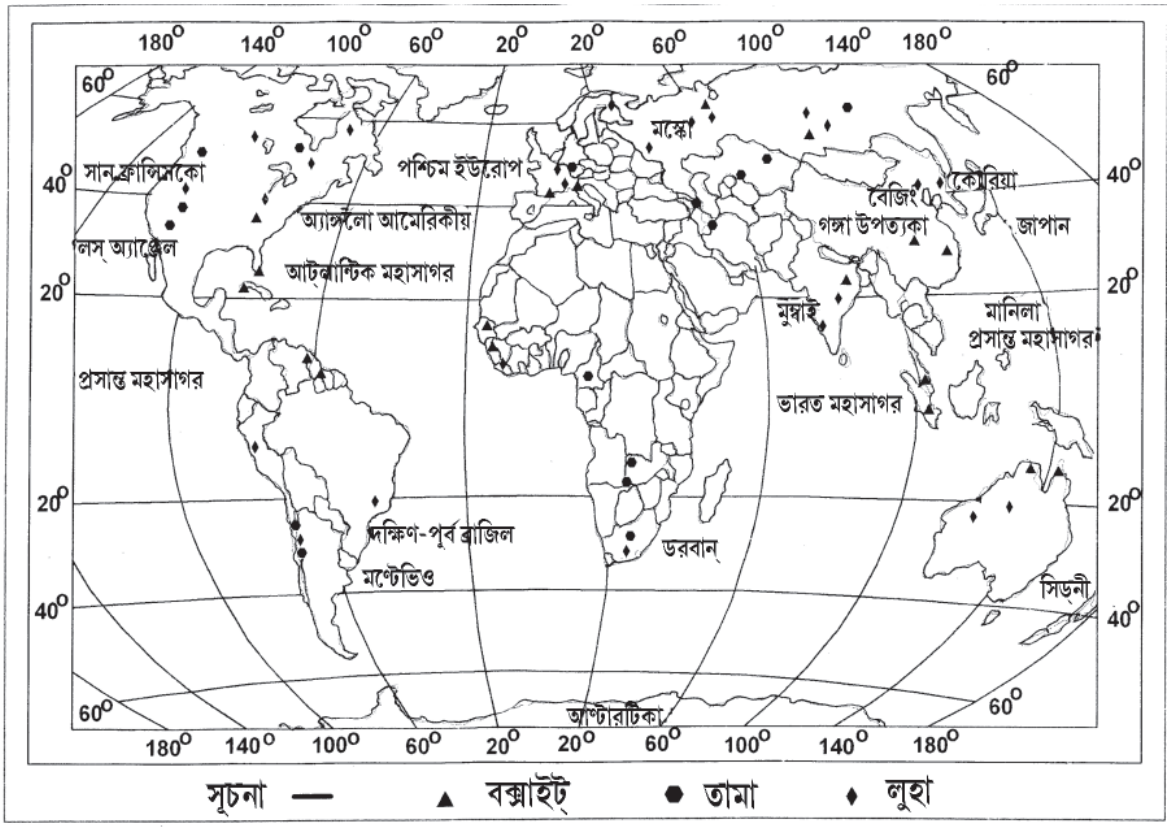

পৃথিবীর মুখ্য খনিকের বিতরণ (পেট্রোল ও কয়লা)

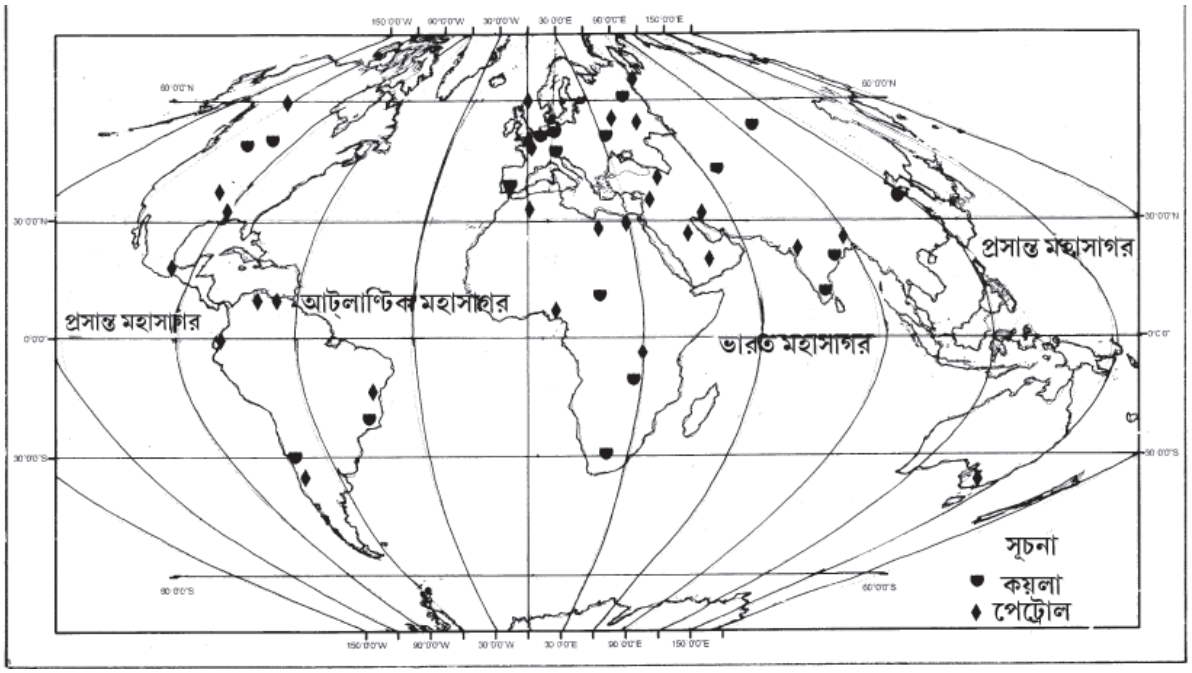

তোমার কাজ ঃ
ভারতের মানচিত্রে, লোহা ম্যাঙ্গানীজ বক্সাইট ও অভ্র প্রভৃতি খনিক পদার্থের প্রাপ্তিস্থান এ্যাটলাস দেখে চিহ্নিত কর।

খনিজ সম্পদের ব্যবহার ঃ

খনিক মুখ্যত ঃ বিভিন্ন শিল্পে ব্যবহার করা হয়।

খনিকের নাম	ব্যবহৃত শিল্পের নাম
লোহা পাথর	লৌহ ইস্পাত
ম্যাঙ্গানিজ	মিশ্রধাতু প্রস্তুত করা।
ক্রোমাইট্	ইস্পাত ও চর্মশিল্প
বকক্সাইট	এ্যালুমিনিয়াম শিল্প
অভ্র	বৈদ্যুতিক শিল্প
কয়লা	তাপবিদ্যুৎ উৎপাদন
খনিজ তেল	বিভিন্ন যানের ইন্ধন ও ঘর্ষন হ্রাসক দ্রব্য প্রস্তুতি।
রত্ন পাথর	অলংকার
তামা	মুদ্রা ও বৈদ্যুতিক শিল্প
কোয়ার্জ	কম্পিউটারে ব্যবহৃত সিলিকন তৈরী।

খনিক সম্পদের সংরক্ষণ ঃ

খনিক (খনিজ) নবীকরণযোগ্য সম্পদ নয়। খনিকের সৃষ্টি হতে হাজার হাজার বছর লাগে। কিন্তু মানুষ সেটাকে খুব স্বল্প সময়ে খরচা করে ফেলে।

তাই খনিকের সংরক্ষণ খুব জরুরী। খনিক সম্পদ সংরক্ষণের জন্য নিম্নলিখিত পদক্ষেপ নেওয়া আবশ্যক ঃ

১) খনিকের উত্তোলনের পরে পিন্ড ও চুর্ণ পরিবহনের সময় যাতে নষ্ট না হয় তার প্রতি যথেষ্ট দৃষ্টি দিলে কিছু পরিমাণে খনিকের সংরক্ষণ সম্ভব হবে।

২) কিছু ক্ষেত্রে ধাতুর পরিবর্ত্তে বিকল্প ব্যবস্থা যথাঃ ধাতুর বদলে প্লাস্টিক, বিদ্যুৎ সরবরাহ ক্ষেত্রে তামার বদলে আলু মিলিনিয়াম তার, ক্ষুদ্র প্রচলন, তামার বদলে ব্রোঞ্জ ব্যবহার করলে অধিক অভাব হওয়া ধাতুর সংরক্ষণ হতে পারবে।

৩) কিছু ধাতব পদার্থ একবার ব্যবহৃত হয়ে অকেজো হয়ে গেলে পুনঃপরিশোধন করে ব্যবহারযোগ্য করা যেতে পারবে।

৪) উচ্চমানের খনিজ পিন্ডের অভাব স্থলে নিম্নমানের পিন্ড ব্যবহার করলে উক্ত খনিক দীর্ঘ সময় সুলভ হবে।

শক্তি সম্পদ

একদিন তিনজন স্কুল ছাত্র পার্কের বেঞ্চে বসে তাদের ঘরে কি কি দামী শৌখিন জিনিষ আছে, সে ব্যাপারে কথাবর্ত্তা করছিল। ওদের কথা বোঝা গেল একজনের ঘরে রেফ্রিজেটার, একজনের ঘরে টেলিভিশন ও আরেকজনের ঘরে কাপড় কাচার মেশিন আছে। ওদের পাশের বেঞ্চে জনৈক বয়স্ক ভদ্র ব্যক্তি ওদের কথা শুনে কাছে এসে বসে বললেন - ছেলেরা তোমরা যে মূল্যবান জিনিষের নাম বললে সেগুলো সর্ব্বদা মূল্যবান নয়। ছেলেরা আশ্চর্য্য হয়ে বললো কেন? ভদ্রলোক বললেন যতক্ষণ ওদের মধ্যে শক্তি সঞ্চারিত হয়, ততক্ষণ সেগুলো কার্য্যক্ষম তাই মূল্যবান, শক্তি না পেলে ওগুলো অকেজো। এদের কার্য্যক্ষয় করার শক্তির নাম হচ্ছে বিদ্যুৎ শক্তি। কেবল বিদ্যুৎ নয়, কয়লা, পেট্রোল, গ্যাসকেও শক্তি রূপে ব্যবহার করা হয়।

বলো তো দেখি পেট্রোল না ঢাললে তোমার মটর সাইকেল চলত কি?

এইসব শক্তির উদ্ভাবন হওয়ার পূর্বে মানুষ নিজের শারিরীক শক্তি ও পশুদের শক্তি ব্যবহার করে কৃষিকার্য্য গমনা গমন, পরিবহন প্রভৃতি কার্য্য সম্পাদন করতো।

নিজে হাল, লাঙল বলদ মোষ প্রভৃতির দ্বারা কৃষিকার্য্য করত, নিজে কিম্বা পশুদের সাহায্যে ডোমকল দিয়ে জল সেচন করতো, পশুবাহিত গাড়ী করে যাতায়াত ও মাল পরিবহন করতো। হাতীর দ্বারা ভারী কাঠের গুঁড়ি জঙ্গল থেকে এনে নদীতে ভেলার সাহায্যে দূরবর্ত্তী স্থানে নিয়ে যেত, গাধাকেও স্থানীয় মাল বহনের কাজে লাগাতো মরুভূমিতে উটের সাহায্যে গমনা গমন ও পরিবহন করা হতো।

মানুষের শারিরীক শক্তি ও পশু শক্তি, অন্যান্য পারস্পরিক শক্তি উদ্ভাবনের পূর্বে ব্যাপক ব্যবহৃত হচ্ছিল।

সুখে সাচ্ছন্দ্যে আরাম দায়ক জীবন যাপনের জন্য আধুনিক মানুষের যেসব দ্রব্য প্রয়োজন হচ্ছে তার ব্যবহারে জন্য শক্তি একান্ত দরকার। শুধু তাই নয়, কৃষি, শিল্প প্রতিরক্ষা, গমনা গমন ও পরিবহন প্রভৃতির জন্যও শক্তির দরকার।

বিজ্ঞানের অগ্রগতির ফলে মানুষের গমনা গমন, পরিবহন, যোগাযোগও গার্হস্থর ক্ষেত্রেও প্রয়োজন বেড়েছে। কিন্তু চাহিদার তুলনায় শক্তির যোগান বৃদ্ধি পাচ্ছে না। ফলে চাহিদা ও যোগানের ফারাক বেড়ে যাচ্ছে। এর ফলে দিন আসবে যখন পৃথিবী শক্তি সম্পদহীন হয়ে যাবে। তাই শক্তি সম্পদের বৃদ্ধির প্রচেষ্টা করা উচিত।

শক্তি সম্পদের শ্রেণী বিভাগ ঃ মানুষ ব্যবহার্য্য শক্তি সম্পদকে প্রধানত, দুভাগে ভাগ করা হয় যথাঃ পারম্পরিক শক্তি ও অপারম্পরিক শক্তি।

পারম্পরিক শক্তি ঃ যে শক্তি বহুকাল ধরে সাধারণ ভাবে ব্যবহার হয়ে আসছে যেমন ঃ কাষ্ঠ, কয়লা, খনিজ তেল, জল বিদ্যুৎ শক্তি ও প্রাকৃতিক গ্যাস প্রভৃতি পারম্পরিক শক্তি রূপে গণ্যকরা হয় ।

জ্বালানী কাঠ ঃ ইন্ধন ও উত্তাপের জন্য কাঠ বেশী ব্যবহার হয় ।গ্রামাঞ্চলে এই কাজে শতকরা ৫০ ভাগ শক্তি জ্বালানী কাঠ থেকে আসে।

জীবাশ্ম জ্বালানী ঃ কয়লা, পেট্রোলিয়াম ও প্রাকৃতিক গ্যাস জীবাশ্ম জ্বালানী রূপে পরিগণিত। উদ্ভিদ্ ও প্রাণীদের নস্টাবশেষ, কোটি কোটি বছর ধরে ভূগর্ভে তাপ ও চাপের ফলে রূপান্তরিত হয়ে, জিবাশ্ম জ্বালানী হয়। পৃথিবীর জনসংখ্যা বৃদ্ধির ফলে জ্বালানীর ব্যবহার যত বাড়ছে। সেই তুলনায় এর সৃষ্টির সময় অত্যন্ত বেশী। সেভাবে বিচার করলে এদের সীমিত গচ্ছিত পরিমাণ দ্রুত শেষ হয়ে যাওয়ার আশঙ্কা রয়েছে।

কয়লা ঃ সমস্ত জীবাশ্ম ইন্ধনের মধ্যে কয়লা একমাত্র ইন্ধন যা প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যায়।

পৃথিবীর গর্ভে উদ্ভিদ পুতে গিয়ে কয়লা সৃষ্টি হয় বলে একে প্রোথিত সূর্য্যালোক বলা হয়।

একে কৃষ্ণহীরা বলেও অভিষিক্ত করা হয়। কয়লা সাধারণতঃ ঘরোয়া জ্বালানী, ইস্পাত শিল্প, বাষ্পিয় ইঞ্জিন এবং বিদ্যুৎ উৎপন্ন ইন্ধন রূপে ব্যবহার করা হয়। কয়লা থেকে উৎপন্ন বিদ্যুৎশক্তিকে তাপ বিদ্যুৎ বলা হয়।

তাপ বিদ্যুৎ কেন্দ্র

পৃথিবীর কয়লা উৎপাদনকারী দেশগুলির মধ্যে চীন, আমেরিকা, রাশিয়া দক্ষিণ আফ্রিকা এবং ফ্রান্স প্রধান রানীগঞ্জ, ঝরিয়া, ধানবাদ আসানসোল এবং বোকারো ভারতের কয়লা উৎপাদনের প্রধান অঞ্চল। আমাদের ওড়িশার অনুগুল, ঝারসুগড়া ও সুন্দর গড়ে কয়লা উৎপাদন হয়। পেট্রোলিয়ামঃ গাড়ী মটর চালানোর পেট্রোল এবং ঘর্ষণ নিরোধক দ্রব্য যে মোটা ঘন তরল পদার্থ থেকে প্রস্তুত হয় তাকে পেট্রোলিয়াম বলে।

তুমি জানো কি?

পেট্রোলিয়াম কথাটা ল্যাটিন ভাষার দুটো শব্দ নিয়ে গঠিত পেট্রো অর্থাৎ শিলা সিয়াম অর্থাৎ তৈল। সেজন্যে একে শিলা তৈল ও বলা হয়।

ভূগর্ভের দুটি শিলা স্তরের মধ্যে পেট্রোলিয়াম সঞ্চিত থাকে। সেখানকার জমা তেল ড্রিলিং করে নলকূপের সাহায্যে ওপরে তুলে আনা হয়। যে তেল ওপরে তুলে আনা হয়, তাকে অপরিশোধিত তেল বলে। এই তেল শোধনাগারে নিয়ে তার থেকে পেট্রোল, ডিজেল, কেরোসিন, প্যারাফিন, গ্রীজ, প্লাস্টিক প্রভৃতি তৈরী হয়। পেট্রোলিয়াম অতি মূল্যবান ও দরকারী হওয়ায় একে কৃষ্ণ সুবর্ণ বলা হয়। তৈল ক্ষেত্রগুলি সাধারণতঃ সমুদ্র উপকূল ও কিছুটা সমুদ্রে গর্ভে থাকে। পশ্চিম এশিয়ার মরু ভূমিতেও তৈল ক্ষেত্র রয়েছে। পৃথিবীর প্রধান তৈল উৎপাদন কারী দেশগুলি মধ্যে ইরান, ইরাক সৌদি আরব, রাশিয়া, কাতার, ভেনেজুয়েলা, আমেরিকা এবং আলজেরিয়া প্রধান। ভারতে প্রধানতঃ আসামের ডিগ্‌বয়, মহারাস্ট্রের বম্বে হাই এবং গোদাবরী ও কৃষ্ণা নদীর ত্রিকোণ ভূমি উল্লেখযোগ্য।

অশোধিত তৈল

ওড়িশায়, মহানদীর অববাহিকা ও পারাদ্বীপের সমুদ্রকূলে তেলের সন্ধান পাওয়া গেছে।

প্রাকৃতিক গ্যাস ঃ এই গ্যাস ভূগর্ভের পেট্রোলিয়ামের সঙ্গে মিশে সঞ্চিত থাকে। পেট্রোলিয়াম নিস্কাশনের সময় মিশ্রিত অবস্থায় কিম্বা স্বতন্ত্র নলকূপের দ্বারা তুলে আনা হয়।

গ্যাস ঘরোয়া ইন্ধন ও কারখানায় জ্বালানি ইন্ধনে ব্যবহার হয়।

পৃথিবীর খুব কম দেশেই নিজের প্রাকৃতিক গ্যাস ক্ষেত্র আছে।

রাশিয়া, নরওয়ে যুক্তরাজ্য, ও নেদারল্যান্ড পৃথিবীর প্রধান গ্যাস উৎপাদনকারী দেশ।

ভারতের জয়সলমীর, কৃষ্ণা, গোদাবরী প্রভৃতি ত্রিকোণ ভূমি, এবং ত্রিপুরা ও বম্বে হাই তে এবং বম্বের নিকট সমুদ্র গর্ভে প্রাকৃতিক গ্যাস পাওয়া যায়।

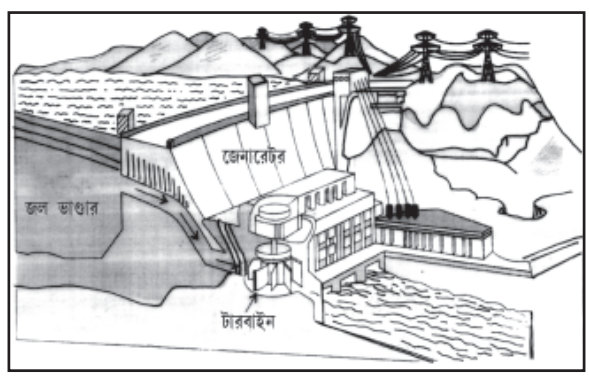

চিত্র

জল বিদ্যুৎ উৎপাদন কৌশল

জলবিদ্যুৎ ঃ নদীর জল কিংবা বৃষ্টির জল বাঁধ দিয়ে আটকে জল ভাণ্ডার সৃষ্টি করা হয়। এই জল পাইপের দ্বারা অতি বেগে তলায় থাকা টারবাইন, ব্লেডকে ঘোরালে জেনারেটারে বিদ্যুৎ শক্তি উৎপন্ন হয়। একে জলবিদ্যুৎ বলা হয়। পৃথিবীতে উৎপাদিত মোট বিদ্যুৎ শক্তির এক চতুর্থাংশ জলবিদ্যুৎ। পৃথিবীর প্রধান জল বিদ্যুৎ উৎপন্নকারী দেশ হচ্ছে ব্রাজিল, চীন, নরওয়ে ও প্যারাগুয়ে। ভারতের জল বিদ্যুৎ শক্তি উৎপন্ন করা কেন্দ্রর মধ্যে ভাক্রানাঙ্গল, গান্ধী সাগর, নাগার্জুন সাগর ও দামোদর উপত্যকা যোজনা প্রধান ওড়িশার হীরাকুদ নদীবাধ জল বিদ্যুৎ উৎপন্ন কেন্দ্রগুলির মধ্যে প্রধান।

তুমি জানো কি ? নয়ে পৃথিবীর প্রথম জলবিদ্যুৎ শক্তি ব্যবহারকারী দেশ

অপারম্পরিক শক্তির উৎস ঃ আধুনিক যুগে জীবাশ্ম জ্বালানীর বিপুল ব্যাবহার এই জ্বালানী ক্রমশঃ হ্রাস পাচ্ছে এবং এভাবে ব্যবহার হতে থাকলে জ্বালানী একদিন। নিঃশেষ হয়ে যাবে। তাছাড়া এই জ্বালানী পরিবেশ দূষণকারী পারম্পরিক শক্তির ব্যবহার কম করে, সৌরশক্তি, বায়ুশক্তি, জোয়ার ভাটার শক্তির ব্যবহার করা দরকার এই সব নতুন প্রকার শক্তিকে অপারম্পরিক শক্তি বলা হয়।

সৌরশক্তি ঃ দিনের বেলায় পাওয়া সূর্য্যের আলো ও উত্তাপকে ধরে সৌরসেলের মাধ্যমে বিদ্যুৎ উৎপন্ন করা হয়। ক্রান্তীয় দেশগুলোতে সূর্যালোক বেশী স্থায়ী হয় ও আলোর প্রখরতা বেশী হয় বলে, এর ব্যবহার প্রচুর হয়। সৌরশক্তিকে রাস্তার আলো, চুল্লী, ট্রাফিক সিগন্যাল ইত্যাদির জন্য ব্যবহার করা হয়।

তুমি জানো কি ? সৌর ও বায়ুশক্তি ব্যবহার করতে থাকা পৃথিবীর একমাত্র বাস ডিপো স্কটল্যান্ডে অবস্থিত।

পবন (বায়ু) শক্তি ঃ বায়ু এক অসীম শক্তি। আবহমান কাল ধরে বায়ু কলের সাহায্যে জল তোলা ও শষ্য পেসাই এর কাজ হচ্ছে। আধুনিক বায়ু মেশিন দ্বারা জেনারেটারের পাত ঘুরিয়ে বিদ্যুৎ উৎপন্ন করা হচ্ছে। সমুদ্র উপকূল ও গিরিপথে, বায়ুর বেগ প্রবল হওয়ায়, সেখানে, একাধিক বায়ুকলকে নিয়ে পবন ফার্ম গঠিত হয়েছে। নেদারল্যান্ড, জার্মানী, ডেনমার্ক, যুক্ত রাজ্য, আমেরিকা স্পেন প্রভৃতি জায়গায় এ ধরণের ফার্ম , দেখা যায়। ভারতের উপকূলবর্ত্তী কর্নাটক, তামিলনাড়ু, ওড়িশা, আন্দামান, নিকোবর দ্বীপপুঞ্জে, ও লাক্ষা দ্বীপে এই পবন শক্তির উপযোগের সুবিধে আছে।

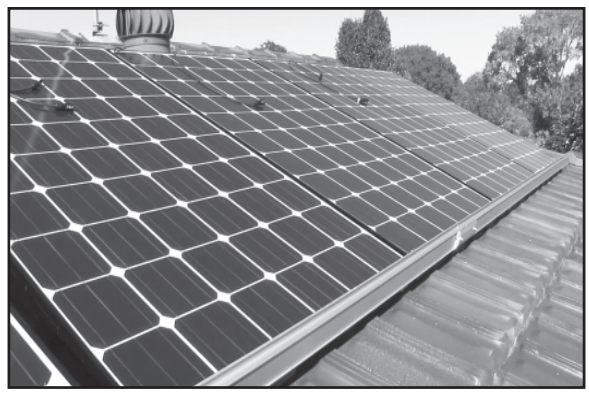

সৌর ফলক (Solar Panel)

আনবিক শক্তি ঃ প্রাকৃতিক অবস্থায় থাকা ইউরোনিয়াম, থোরিয়াম ইত্যাদি শক্তি, আনবিক, রিয়্যাক্টরে ব্যবহার আনবিক শক্তি উৎপন্ন করা হয়। আমেরিকা ও ইউরোপ আনবিক শক্তির বৃহৎ উৎপাদনকারী। ভারতের ঝড়খন্ডে ও রাজস্থানে প্রচুর পরিমাণে ইউরোনিয়াম পাওয়া যায়।

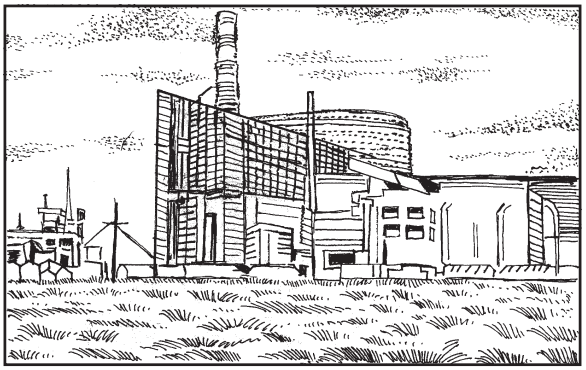

পরমাণু শক্তি উৎপাদন কেন্দ্র - কল্পকম্

কেরলে মোনাজাইট বালিতে বিপুল পরিমাণে থোরিয়াম পাওয়া যায়। ভারতের আনবিক শক্তি উৎপাদন কেন্দ্রগুলির মধ্যে তামিলনাড়ুর কল্পক্কম্, মহারাষ্ট্রের তারাপুর, রাজস্থানের কোটার নিকটে রানা প্রতাপ সাগর, উত্তর প্রদেশের নরোরা ও কর্নাটকের নইগা উল্লেখযোগ্য।

ভূতাপ শক্তি ঃ পৃথিবীর অভ্যন্তর থেকে উৎপন্ন হওয়া শক্তিকে ভূতাপ শক্তি বলা হয়। পৃথিবীর অভ্যন্তর ভূকেন্দ্রের দিকে উত্তাপ ক্রমশ বৃদ্ধি পায়। স্থানে স্থানে এই উত্তাপ উষ্ণ প্রস্রবনের আকারে বেরিয়ে আসে। এই উত্তাপকে ব্যবহার করে যে শক্তি উৎপন্ন হয়, তা রান্না, স্নান ও উত্তপ্ত করার কাজে লাগে। আমেরিকা পৃথিবীর সর্ববৃহৎ ভূতাপ শক্তির উৎপাদনকারী দেশ। এছাড়া নিউ জিল্যান্ড, আইসল্যান্ড, কেন্দ্র আমেরিকা, ফিলিপাইন্স দেশেও ভূতাপ শক্তি উৎপন্ন হয়। ভারতের হিমাচলে মনিকরণ ও লাদাখের পুগা অঞ্চলে ভূতাপ শক্তির কেন্দ্র স্থাপিত করা হয়েছে।

জোয়ার ভাঁটার শক্তি ঃ সমুদ্রের জোয়ার কে উপযোগ করে যে শক্তি উৎপন্ন করা হয় তাকে জোয়ার শক্তি বলা হয়। এর জন্যে সমুদ্রের সংকীর্ণ মুক্ত পথে পাথরের বাঁধ দেওয়া হয়। উচ্চ জোয়ারের সময় জোর জলের তোড়ে, বাঁধা থাকা টারবাইন ঘুরে বিদ্যুৎ শক্তি উৎপন্ন হয়।

ভূতাপ বিদ্যুৎ কেন্দ্র

পৃথিবীতে রাশিয়া ও গ্রীসে এবং ভারতের উপসাগরে জোয়ার শক্তির বিরাট কেন্দ্র গড়ে উঠেছে। ভারতের গুজরাটের কাম্বে উপকূলে ও পশ্চিমবঙ্গের সুন্দরবনে জোয়ার শক্তি উৎপাদন হচ্ছে।

বায়ো গ্যাস ঃ জৈবিক বর্জ্য বস্তু যথা গোবর, মৃত উদ্ভিদ ও প্রাণীদের অংশ একটি ড্রামে রাখলে সেগুলোকে ব্যাক্টেরিয়া পচিয়ে দেয় এবং তার থেকে মিথেন ও অঙ্গারকাম্ল গ্যাস নির্গত হয়। একে বায়োগ্যাস বলে।

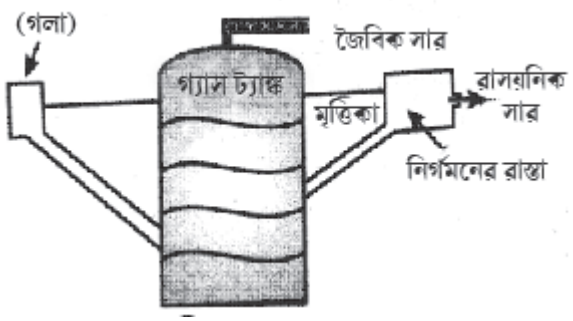

জৈবিক গ্যাস প্রক্রিয়া

এই গ্যাস রান্না ও আলো জালার কাজে ব্যবহার হয়। গ্যাস নির্গত শেষ হয়ে গেলে বর্জ্যবস্তুকে সার রূপে কৃষিক্ষেত্রে প্রয়োগ করা হয়। গ্রামাঞ্চলে বায়োগ্যাস জ্বালানীর জন্যে কোনো মূল্য দিতে হয় না। লোকেদের কাছে এটা খুবই জনপ্রিয় ও আদৃত।

শক্তি সংরক্ষণ ঃ আধুনিক মানুষের কাছে শক্তি এক অপরিহার্য্য প্রয়োজন। মানুষের জীবনে শক্তি এত গুরুত্বপূর্ণ যে শক্তি বিনা এক মুহূর্ত থাকতে পারবে না।

আজকের যান্ত্রিক যুগে নিজের নিত্যকর্ম থেকে আরম্ভ করে ঘরোয়া কাজ। গমনা গমন, পরিবহন, কৃষি, শিল্প বনিজ, যোগাযোগ, শিক্ষা, স্বাস্থ্য, মনোরঞ্জন প্রভৃতির জন্য শক্তি সর্বপ্রথম। কিন্তু সব পারস্পরিক শক্তিই ক্ষয়শীল, একদিন আসবে যখন সব পারস্পরিক শক্তিই নিঃশ্বেস হয়ে যাবে। তাই শক্তির অপচয় না করে সংরক্ষন করা উচিত। নিম্নে বর্ণিত কিছু পদক্ষেপ নিলে শক্তির সংরক্ষণ কিছুটা পরিমাণে সম্ভব হতে পারবে। শক্তি সংরক্ষণ করার সম্ভাব্য পদক্ষেপ।

১) কোনো কাজে স্বল্প দূরত্বে গেলে মোটর গাড়ী ব্যবহার না করে সাইকেল ব্যবহার করা উচিত।

২) যান্ত্রিক গাড়ী চালানোর সময় কোথাও আটকে থাকলে স্টার্ট বন্ধ করা রাখা।

৩) নিয়মিত ভাবে মোটর যান গ্যারেজে নিয়ে পরীক্ষা করানো

৪) নিয়মিত ভাবে ঘর্ষন হ্রাসক দ্রব্য ব্যবহার করা।

৫) ঘর থেকে বেরোবার সময় ঘরের সমস্ত বিদ্যুৎ সুইচ্ বন্ধ করা।

৬) ঘরের সব আলোর পয়েন্টে কম্ শক্তির অধিক উজ্জ্বল আলো লাগালে শক্তি ক্ষয় কম হবে।

৭) গ্যাস চুল্লী, হিটার বা কেরোসিন স্টোভ রান্না করলে রান্নার পূর্বে সব প্রস্তুতি সেরে নেওয়া।

৮) রান্নার সময় পাত্রের ওপর ঢাকনা ব্যবহার করলে কম শক্তি খরচে শিঘ্র রান্না হবে।

এই সমস্ত সতর্কতা মূলক পদক্ষেপ সম্বন্ধে পরিবারের বয়স্ক ব্যাক্তিরা এবং বিদ্যালয়ের শিক্ষক গন ছাত্র ছাত্রীদের সচেতন করালে ওরা ছোটবেলা থেকে এতে অভ্যস্থ হবে এবং ভবিষ্যতে সুনাগরিক হয়ে দেশের ও সমাজের উন্নতি করতে পারবে। শক্তি সর্ব্বত্র বিদ্যমান। কিন্তু আহরন করা কষ্টকর ও ব্যায়সাপেক্ষ। অতএব মানুষের উচিত এর অপচয় না করে সঞ্চয় করা।

প্রশ্নমালা

১। নিম্নলিখিত প্রশ্নগুলির উত্তর লেখ।

ক) ভূমিকে গুরুত্বপূর্ণ সম্পদ বলা হয় কেন?

খ) মৃত্তিকার বিভিন্ন স্তর এঁকে নাম লেখ।

গ) পৃথিবীতে সর্বদা জলের মোট পরিমাণ সমান থাকে কিভাবে সম্ভব চিত্র এঁকে বোঝাও।

ঘ) প্রাকৃতিক উদ্ভিদ মানুষের কি কি প্রয়োজন পূর্ণ করে লেখ।

ঙ) বন্যপ্রাণী সংরক্ষণের জন্য নেওয়া পদক্ষেপ আলোচনা কর।

চ) তোমার ঘরে শক্তি সংরক্ষণ করার জন্য নেওয়া পাঁচটি পদক্ষেপ লেখ।

২। নিম্নলিখিত প্রশ্নগুলির উত্তর লেখ।

ক) ভূমি ব্যবহারের চারটি প্রাকৃতিক নিয়ামকের নাম লেখ।

খ) মৃত্তিকা যে প্রাথমিক শিলা থেকে সৃষ্টি হয়, সেই শিলা, মৃত্তিকার কোন কোন গুণকে প্রভাবিত করে?

গ) জল সংরক্ষণের চারটি পদক্ষেপ নির্ণয় কর।

ঘ) স্বল্প বৃষ্টিপাতযুক্ত শুষ্ক অঞ্চলের উদ্ভিদ এর বিশেষত্ব লেখ।

ঙ) বন্যপ্রাণী বিলোপ হওয়ার চারটি প্রাকৃতিক কারণ লেখ।

চ) অধিক পরিমাণে প্রাকৃতিক গ্যাস গচ্ছিত থাকা দুইটি অঞ্চলের নাম লেখ।

ছ) গ্রামাঞ্চলের জনপ্রিয় হওয়া দুটি শক্তি উৎসের নাম লেখ।

৩। **নিম্নলিখিত প্রশ্নের নীচে দেওয়া চারটি সম্ভাব্য উত্তরের মধ্য থেকে সঠিক উত্তরটি বেছে লেখ।**

ক) কোথায় ভূব্যবহার মানবীয় নিয়ামক নয়

১) শ্রম শক্তি ২) প্রয়োগের কৌশল

৩) খনিক ৪) জন সংখ্যা

খ) মৃত্তিকা স্তরের ঘনত্ব কোন নিয়মে প্রভাবিত হয়?

১) প্রাথমিক শিলা ২) গঠনের সময়কাল

৩) জলবায়ু ৪) উদ্ভিদ ও প্রাণী

গ) পৃথিবীতে থাকা মিষ্টি জল শতকরা কত ভাগ মানুষের ব্যবহার উপযুক্ত?

১) এক ২) তিন

৩) দুই ৪) চার

ঘ) ফুলের পরাগ সঙ্গমে প্রধান দায়ী কে?

১) পশু ২) মৌমাছি

৩) পক্ষী ৪) গঙ্গা ফড়িং

ঙ) কোন খনিক পিন্ড থেকে আলু মিনিয়াম পাওয়া যায়?

১) ক্রোমাইট্ ২) ম্যাঙ্গানীজ

৩) বক্সাইট ৪) অভ্র

চ) পুগা উপত্যকা কোথায় অবস্থিত?

১) হিমাচল প্রদেশে ২) লাদাখ

৩) অরুণাচল প্রদেশ ৪) মধ্যপ্রদেশ

ছ) কোন রাজ্যে অভ্রখনি নেই?

১) ঝাড়খন্ড ২) কর্ণাটক

৩) রাজস্থান ৪) বিহার

৪। **'ক' স্তম্ভে থাকা বিষয়কে 'খ' স্তম্ভে থাকা সংপৃক্ত বিষয়কে জোড়ো।**

'ক' স্তম্ভ	'খ' স্তম্ভ
১) ভূঅবক্ষয় নিরোধ	জলের সঞ্চয়ে সাহায্য
২) পাথরের বাঁধ	জনসচেতনতা
৩) চালু ভূমি	মৃত্তিকাক্ষয় রোধ
৪) সামাজি বনসৃজন	নিয়ন্ত্রিত পশুচারন
৫) কৃষ্ণ সুবর্ণ	সোপান চাষ পেট্রোলিয়াম

৫। **পার্থক্য দেখাও ঃ**

ক) পার্বত্য ও সমতল ভূমি।

খ) পরিবাহিত মৃত্তিকা ও অবক্ষয়িত মৃত্তিকা।

গ) চিরহরিৎ ও পর্ণমোচী অরণ্য।

ঘ) জৈব মণ্ডল ও বারিমণ্ডল।

ঙ) ধাতব খনিক ও অধাতব খনিক।

চ) খনিক ও খনিক পিন্ড

ছ) পারস্পরিক ও অপাম্পরিক শক্তি

জ) প্রাকৃতিক ও বায়ো গ্যাস

৬। **ভারতের মানচিত্র দর্শাও ঃ**

ক) চন্দকা হাতী অভয়ারণ্য।

খ) বম্বে হাই।

গ) কর্বেট জাতীয় অরণ্য।

ঘ) গীর জাতীয় অরণ্য।

ঙ) কাজিরাঙা জাতীয় অরণ্য।

চ) কাজিরাঙা জাতীয় অরণ্য।

ছ) কল্পক্কম্ পরমাণু শক্তি কেন্দ্র।

জ) রানা প্রতাপ সাগর।

ঝ) নইগা পরমাণু শক্তি কেন্দ্র।

৭। **কারণ দর্শাও ঃ**

ক) নদী উপত্যকায় সমতলভূমি উর্ব্বর।

খ) পরিবাহিত মৃত্তিকার সঙ্গে অন্তঃ ভূমির সামঞ্জস্য না থাকা।

গ) মনুষ্য ব্যবহৃত জল, পৃথিবীর এক অমূল্য সম্পদ।

ঘ) স্বল্প বৃষ্টিপাতের শুষ্ক অঞ্চলের বৃক্ষরা কন্টাকীর্ণ।

ঙ) মুদ্রা প্রচলনে তামার বদলে ব্রোঞ্জ ধাতু ব্যবহার করা হয়।

চ) কয়লাকে প্রোথিত সূর্য্যালোক বলা হয়।

ছ) গ্রামাঞ্চলে বায়োগ্যাস জ্বালানি বেশী উপযোগি।

তৃতীয় অধ্যায়

কৃষি

গৌতম, সলমান ও গুরুচরন একদিন গ্রামের রাস্তায় যেতে যেতে কাছের জমিতে লাঙল নিয়ে একজন কৃষককে চাষ করতে দেখল। ওরা কৃষককে জিজ্ঞাসা করল

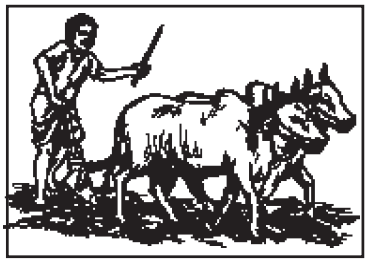

' ভাই তুমি জমিতে কি লাগাবে ' কৃষক ভাই বলল ' আমি জমিতে ধান বুনবো। তার আগে জমি উর্ব্বর করার জন্য জমিতে সার দোব।

গাছ বড় হয়ে গেলে ধান ফলবে ও পেকে গেলে কাটবো। ঘরোয়া প্রক্রীয়া করে শুখিয়ে নিকটবর্ত্তী ধানকলে নিয়ে ভানিয়ে চাল করবো।

যান্ত্রিক কৃষি

চাল হয় গরু গাড়ী নয় ট্রাক্টরে করে হাটে নিয়ে বিক্রী করবো। তোমাদের বাড়ীতে তোমার মা এই চাল থেকে ভাত, পিঠে ও অনেক প্রকার সুস্বাদু খাদ্য দ্রব্য তৈরী করবে। গৌতম বলল ভাই তুমি ট্রাক্টরে চাষ করলে শীঘ্র চাষ হয়ে যেত। কৃষক বলল আমাদের গাঁয়ের জুমির আকার ছোট ছোট। তাই ট্রাক্টরে চাষ করা সম্ভব নয়। ছেলেরা চাষী ভায়ের কাছ থেকে অনেক কিছু শুনে বেশ খুশী হোলো গৌতম, সলমান ও গুরুচরণ বুঝতে পারলো যে তিনটি প্রক্রিয়া দ্বারা প্রাকৃতিক পরিবেশ পাওয়া দ্রব্য মানুষের ব্যবহার উপযোগী হতে পারছে। এই তিনটি প্রক্রিয়া হলো প্রাথমিক, দ্বিতীয় ও তৃতীয় প্রক্রিয়া। প্রাথমিক প্রক্রিয়া, প্রাকৃতিক পরিবেশ থেকে বিভিন্ন দ্রব্য সংগ্রহ যথা - জমির শস্য উৎপাদন, নদী ও জলাশয় থেকে মাছ সংগ্রহ, জঙ্গলথেকে কাঠ, বাঁশ, ফল, ধুনো, মধু, খনি থেকে বিভিন্ন ধাতু উত্তোলন ও পশুপালন কার্য্যগুলি প্রাথমিক প্রক্রিয়া।

দ্বিতীয় প্রক্রিয়া ঃ বিভিন্ন দ্রব্যকে যান্ত্রিক পদ্ধতিতে রূপান্তরিত অর্থাৎ ধান থেকে চাল, গম থেকে আটা, বীজ থেকে তেল, তুলো থেকে কাপড়, আখ থেকে চিনি ও খনিক দিয়ে বিভিন্ন যন্ত্রপাতি তৈরী করা দ্বিতীয় প্রক্রিয়ার অন্তর্ভুক্ত।

তৃতীয় প্রক্রিয়া ঃ চাল তৈরী করার পর গাড়ীতে করে অন্য স্থানে পাঠানো তৃতীয় প্রক্রিয়া সেইরূপ পরিবহন সেবার মতো ব্যাঙ্ক, টেলিফোন, বীমা, বানিজ্য ও বিদ্যুৎ জোগানো প্রভৃতি তৃতীয় প্রক্রিয়ার অন্তর্ভুক্ত।

কৃষি অতি প্রাচীন। কেবল শস্য উৎপাদন নয়, পশুপালন, মৎস্য চাষ, মৌমাছি পালন, রেশম পোকা পালন সবজি চাষ, ও ফুল এবং ফলের চাষ ও কৃষির আওতায় পড়ে।

পৃথিবীর শতকরা ৬৫ ভাগ ও ভারতের মতো বিকাশ শীল দেশের প্রায় দুই তৃতীয়াংশ লোক কৃষিকার্য্যকে নিজের জিবীকা করেছেন। কৃষি খাদ্যর সঙ্গে শিল্পের জন্য কাঁচামালও যোগায়।

নিবেশ ঃ দ্রব্য উৎপাদনে ব্যবহৃত প্রয়োজনীয় উপাদান।

কৃষিকার্য্যের অনুকূল অবস্থা ঃ

কৃষিকার্য্যের জন্য উপযুক্ত পরিবেশ যথা সূর্য্যের উত্তাপ, বৃষ্টিপাত, ভূমির গঠন, উপযোগী মৃত্তিকা ও জলসেচন ইত্যাদি প্রয়োজন। এগুলিকে প্রাকৃতিক বা ভৌতিক নিবেশ বলা হয়। কৃষির জন্য শ্রম, বীজ, যন্ত্রপাতি, সার ও কীটনাশক জল সেচন শষ্য সংরক্ষণ ব্যবস্থা প্রভৃতিকে মানবীয় নিবেশ বলে। এছাড়া জমির মালিকানা আর্থিক বিকাশ কৃষিনিতী ও কৃষির মানবৃদ্ধি সহায়ক হয়। প্রাকৃতিক ও মানবীয় নিবেশের ওপর কৃষির উৎপাদন বিশেষ ভাবে নির্ভর করে। কৃষির উন্নতি, দেশের সামাজিক, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক উন্নতির ওপর প্রভাব বিস্তার করে।

কিছু ফসল ক্রান্তীয় জলবায়ুতে সুফলিত হয় এবং কিছু শষ্য উপক্রান্তীয় ও নাতিশীতোষ্ণ জলবায়ুতে উৎপাদিত হয়। পুরাতনকালে লোকে শাবল, ফাবড়া, কোদাল ইত্যাদির সাহায্যে চাষের কাজ করতো। কালক্রমে লাঙল গরু দিয়ে চাষ আরম্ভ হলো। আমেরিকা রাশিয়া, কানাডা প্রভৃতি দেশে উন্নতযন্ত্রে সম্পূর্ণ চাষ কার্য্য সম্পন্ন করা হয়। ফলে চাষের কাজে কম লোক নিয়োজিত হয় ও বাড়তি লোকেরা কলকারখানায় ও অন্যান্য সংস্থায় কাজ করে থাকেন।

ঃ কৃষি পদ্ধতি ঃ

নিবেশ	প্রক্রিয়া	উৎপাদন
প্রাকৃতিক ঃ সূর্য্যালোক, উত্তাপ বৃষ্টিপাত, ভূমির গঠন - মৃত্তিকা **মানবীয় ঃ** যন্ত্রপাতি, বীজ, শ্রম, সার ও কীটনাশক দ্রব্য	কৃষিকার্য্য বীজ বোনা জলসেচ কীটনাশক ওষুধ প্রয়োগ করা।	শষ্য, তুলো, পাট, পশম, দুধ, মাংস, ডিম, আনাজ, ফুল, ফল।

কৃষির প্রকার ভেদ ঃ

চাষের প্রণালী, জমির আকার, ভৌগোলিক পরিবেশ, শ্রম, উৎপাদিত দ্রব্যের চাহিদা ঃ এবং কৃষি যন্ত্রপাতির ব্যাবহারের ভিত্তিতে কৃষিকে মুখ্যতঃ দুভাগে বিভক্ত ঃ যথাঃ প্রয়োজন ভিত্তিক কৃষি ও বাণিজ্য ভিত্তিক কৃষি ঃ

১) **প্রয়োজন ভিত্তিক কৃষি ঃ** এই ধরণের কৃষি সাধারণতঃ গরীব ছোট ছোট চাষীরা তার পরিবারের খাদ্য মেটানোর জন্যে করে থাকে। সে তার ছোট জমিতে পারস্পরিক প্রথায়, স্বল্প সার প্রয়োগ ও কীটনাশক প্রয়োগ করে সাধারণ মানের বীজ বপন করে চাষ করে। ফলে উৎপাদন কম হয়। ভারত চীন প্রভৃতি দেশে এই প্রথা খুবই প্রচলিত।

প্রয়োজন ভিত্তিক চাষ মুখ্যতঃ তিনটি প্রচলিত চাষকে বোঝায়।

১) পশুচারণ ২) স্থানান্তরিত ও সঘন প্রয়োজন ভিত্তিক কৃষি।

পশুচারন ঃ পশুচারন অতি প্রাচীন। সাধারণঃ যাযাবরেরা ভেঁড়া, ছাগল, গরু, উট, চমরী গাই নিয়ে তৃণভূমির খোঁজ বিভিন্ন অঞ্চলে বিচরণ করত। সাহারার শুষ্ক অঞ্চলে পূর্ব ও দক্ষিণ পশ্চিম আফ্রিকা মধ্য এশিয়া। ইউরেশিয়ার উত্তরে, ভারতের রাজস্থান এবং জম্মু কাশ্মীরের কিছু স্থানে এই যাযাবরদের দেখা যায়।

পশুর চামড়া মাংস, হাড়, দুধ, লোম ইত্যাদি বিক্রী করে এদের পরিবার পোষন কার্য্য চলে।

স্থান্তান্তরিত কৃষি ঃ এধরনের কৃষিকার্য্যে প্রথমে জঙ্গলের ছোট গাছ, ডালপালা পাতা ইত্যাদি পুঁড়িয়ে ছাই মাটিতে মিশিয়ে জঙ্গলের মাটির উর্ব্বরতা বৃদ্ধি করা হয়। জমিতে দু-তিন বৎসর চাষ করার পর জমির উর্ব্বরতা কমে যায়। তাই সেই জমি পরিত্যাগ করে অন্য কোনো স্থানে পুনঃরায় উক্ত প্রক্রীয়াতে চাষ করা হয়। ক্রমাগত ভাবে স্থান ত্যাগ করে এই ভাবে চাষ করাকে স্থানান্তরিত চাষ বলা হয়।

জঙ্গল কেটে ও কাঠ ও পাতা পুড়িয়ে জমিতে চাষ করা হয় বলে একে 'কর্ত্তন' ও 'দহন' কৃষিও বলা হয়। দক্ষিণ আমেরিকার আমাজন নদী অববাহিকার অরণ্য অঞ্চল, আফ্রিকার ক্রান্তীয় অঞ্চল, দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ার ও উত্তর পূর্ব ভারতের কিছু অঞ্চলে স্থানান্তরিত কৃষিকার্য্য হয়। উত্তর পূর্ব ভারতে একে ঝুম ও ওড়িশার পাহাড়ি মাল অঞ্চলে পোডু চাষ বলা হয়। ভুট্টা ও দিশি আলু এ অঞ্চলের প্রধান কৃষি।

তুমি জানো কি?

স্থানান্তরিত কৃষির নাম	স্থানের নাম
ঝুম্	উত্তর পূর্ব ভারত
পুনম্	কেরল
পোডু	ওড়িশা
রোকা	ব্রাজিল

৩) **সঘন প্রয়োজন ভিত্তিক কৃষি ঃ** ছোট ছোট জমিতে উন্নত বীজ। নিয়মিত জলসেচ নির্দ্দিষ্ট পরিমানে সার প্রয়োগ করে অধিক শ্রমিক লাগিয়ে বেশী ফসল উৎপাদন কে সঘন প্রয়োজন ভিত্তিক চাষ বলে।

তোমার কাজ ঃ বিভিন্ন পত্রিকা টেলিভিশন, ইন্টারনেট থেকে পোড়ে চাষের অঞ্চল ও চাষীদের কথা জেনে রাখো। এবং শ্রেণী কক্ষে উপস্থাপন কর।

উর্ব্বর মৃত্তিকা ও অনুকূল জলবায়ু একাধিক ফসল ফলানো সম্ভব হয়। দক্ষিণ ও দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ার মৌসুমী অঞ্চলে, পশ্চিম ইউরোপে ও ভূমধ্যসাগরীয় অঞ্চলে সঘন কৃষি করে অধিক পরিমানে ফসল উৎপন্ন করা হয়ে থাকে। ধান এই অঞ্চলের প্রধান ফসল। এছাড়া ভুট্টা, গম, ডাল জাতীয় শস্য, তৈল বীজ চাষ ইত্যাদি করা হয়। ভারতের কৃষক নিজের চাহিদা মেটাতে সঘন প্রণালীতে বিভিন্ন শস্য উৎপন্ন করে।

২. বাণিজ্যিক কৃষি ঃ

কৃষি জাতপন্য বাজারে বিক্রী করা এর প্রধান উদ্দেশ্য বিভিন্ন স্থানের বা দেশের মধ্যে কৃষিজাত পন্যের ব্যবসা বা বিনিময় করা হয় বলে একে বানিজ্যভিত্তিক কৃষি বলা হয়। দেশের চাহিদা পূরণ করে, বাড়তি দ্রব্যের রপ্তানি করে অর্থলাভ করা হয় বলে একে অর্থকারী কৃষিও বলা হয়। আমেরিকা, রাশিয়া, কানাডা, ইউক্রেন, আর্জেন্টিনা, অস্ট্রেলিয়া প্রভৃতি দেশের কৃষি জমির আকার বৃহৎ হয়। ফলে চাষ করা, বীজ বোনা সার ও কীটনাশক প্রয়োগ করা জলসেচিত করা ও ফসল কাটা সব কিছু যান্ত্রিক উপায়ে করার ফলে প্রচুর শষ্য উৎপন্ন হয়। গম, ভূট্টা ও কার্পাস, তুলা এদের প্রধান ফসল। বাণিজ্যিক ভিত্তিক এই কৃষিতে শষ্যের সঙ্গে পশুপালন মৎস চাষ, মুর্গি চাষ, রবার, চা, কফি, ফল ও আনাজ ইত্যাদি চাষীরা চাষ করে থাকে। ভারতের পাঞ্জাব ও হরিয়ানায় ব্যাপক হারে গমচাষ করে রপ্তানী করা হয়।

তোমার কাজ ঃ
ব্যাবসায়িক ভিত্তিতে তোমদের অঞ্চল থেকে বাইরে পাঠানো কৃষি দ্রব্যের তালিকা তৈরী করো।

মিশ্র কৃষি ঃ

খাদ্য শস্য ও পশুখাদ্য এবং পশুপালন করাকে মিশ্র কৃষি বলা হয়। বিশেষ ভাবে আমেরিকার পূর্বভাগ, দক্ষিণ আফ্রিকা, নিউজিল্যান্ড, অস্ট্রেলিয়ার দক্ষিণ পূর্বাংশ, ইউরোপ ও আর্জেন্টিনায় করা হয়।

এইসব অঞ্চলের পশুদের ভুট্টা গম ও অন্যান্য খাবার খাইয়ে খুব হৃষ্ট পুষ্ট করা হয়। পরে পশুদের হত্যা করে মাংস রপ্তানী করা হয়। যান্ত্রিক উপায়ে পশুদের কাছ থেকে দুধ, মাংস ও লোম সংগ্রহ করে বিদেশে পাঠানো হয়। যুক্তরাষ্ট্রে আমেরিকার পশুচারণ ভূমিকে র‍্যাঞ্চ বলা হয়।

তোমার কাজ ঃ
নিকটবর্ত্তী এক আনাজ বাগানে গিয়ে সেখানে আনাজ চাষ লক্ষ করে শ্রেণীতে আলোচনা কর।

উদ্যান কৃষি ঃ

শহর ও বড় বড় নগরের বাসিন্দাদের জন্য তার চারিদিকে থাকা বিস্তৃত অঞ্চলে থাকা জমিতে ফল ফুল ইত্যাদি চাষ ও আনাজ পাতি চাষ করা হয়। এই প্রকার কৃষিকে উদ্যান কৃষি বলা হয়। স্বল্প বৃষ্টিপাত অঞ্চলে গ্রীষ্ম ও শীতকালে আনাজপাতি চাষ করা হয়। আনাজপাতি ছাড়া কলা, আম, কাঁঠাল, নারকেল ইত্যাদি চাষ করে চাষী বেশ লাভবান হয়। আমেরিকার উত্তর পূর্বাংশ ও ভারতের উপকূলবর্তী অঞ্চলে এই ধরণের চাষ প্রচুর করা হয়। এটা বিশেষ লাভদায়ক চাষ। বিদেশে ভারতের আমের খুব চাহিদা রয়েছে। ওড়িশার পান ও কেরলের নারকেল অনেক দেশে রপ্তানী করা হয়

রোপন কৃষিঃ

চা, কফি, রবার, আখ, আনারস, কলা, কাজু ইত্যাদি জমিতে একক ফসল হিসেবে রোপন করা হয়। ক্রান্তিয় মণ্ডলের বিস্তৃত অঞ্চলে রোপন চাষ করা হয়। ভারত ও শ্রীলঙ্কা চা চাষে, ব্রাজিল কফি উৎপাদনে, মালশিয়া রবার ও কিউবা আখ চাষে অগ্রণী।

তোমার জানা দরকার ঃ
একক কৃষি নির্দ্দিষ্ট জমিতে ব্যাপক ভাবে চাষ করা মুখ্য কৃষি।

রোপন কৃষি বাণিজ্য ভিত্তিক অর্থকারী কৃষি। রোপন কৃষি করার জন্যে বেশী পুঁজি, বিস্তৃত জমি ও অধিক শ্রমিকের প্রয়োজন হয়। এই ধরণের চাষের প্রক্রিয়া করণ কারখানা নিকস্থ কৃষি জমিতে স্থাপন করে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ ভাবে কর্ম নিয়োজনের সৃষ্টি করে থাকে।

শুষ্ক কৃষি, আদ্র কৃষি ও সেচিত কৃষি ঃ জলের

কলার চাষ

তোমার কাজ ঃ
রোপন কৃষির থেকে প্রস্তুত নিত্য ব্যবহার্য্য দ্রব্য সংগ্রহ করে শ্রেণীকক্ষে রাখ।

ব্যবহারের ওপর নির্ভর করে কৃষি কাজ করাকে শুষ্ক কৃষি, আদ্র কৃষি ও সেচিত কৃষি রূপে বিভক্ত করা হয়। অল্প বৃষ্টিপাত অঞ্চলে বৃষ্টির জল মাটির ভেতরে বেশী প্রবেশ করার জন্য মাটি গভীর ভাবে কর্ষণ করা হয় এবং ছোট ছোট কেয়ারীতে ভাগ করে এই চাষ করা হয়। এখানে বাজরা জোয়ার প্রভৃতি কম জলের ফসলের চাষ করা হয়। মধ্য প্রাচ্য ও পশ্চিম ভারতে এ ধরণের কৃষি বেশী হয়। ক্রান্তীয় অঞ্চলে বেশী পরিমাণে জলাবশ্যক করা ফসল আদ্র কৃষির অন্তর্গত। ধান, পাট, ইত্যাদি এর মধ্যে পড়ে। ভারত বাংলাদেশ, মাইনামার প্রভৃতি দেশে এ ধরণের চাষ ব্যাপক হারে হয়।

তোমার জানা দরকার ঃ

সাধারণতঃ ৫০ সেঃমির কম বৃষ্টিপাতে হওয়া অঞ্চলে শুষ্ক কৃষি ও এর বেশী বৃষ্টি হওয়া অঞ্চলে আদ্র কৃষি কার্য্য হয়।

নদী. নালা, কুয়ো, পুকুর ও জল ভাণ্ডার থেকে জল নিয়ে সেচ প্রণালীতে চাষ করাকে সেচিত কৃষি বলা হয়। ভারত, চীন, বাংলাদেশ, পাকিস্থান প্রভৃতি দেশে এ ধরণের চাষ করা হয়। ভারতে পাঞ্জাব ও হরিয়ানায় কম বৃষ্টিপাত হলেও জলসেচন পদ্ধতি দ্বারা প্রচুর পরিমাণে শষ্য উৎপাদন করা হয়।

তোমার কাজ ঃ

আদ্র কৃষি ও শুষ্ক কৃষি হওয়া ওড়িশার জেলাগুলির তালিকা করে শ্রেণীতে দেখাও।

প্রধান কৃষিজাত দ্রব্যঃ পৃথিবীর লোক সংখ্যা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে বিভিন্ন শস্যের চাহিদা বেড়ে চলেছে। এই শস্যের মধ্যে কিছু কিছু আবার শিল্পের কাঁচামাল হিসেবে ব্যবহার হয়। গম, ধান বাজরা ভুট্টা প্রভৃতি মুখ্য খাদ্য শস্যে রূপে ব্যবহার করা হয়। সেইরূপ পাট ও কার্পাস তন্তুজাতীয় ফসল ও চা কফি প্রভৃতি মুখ্য পানীয় ফসল।

গম ঃ নাতিশীতোষ্ণ অঞ্চলে থাকা পৃথিবীর বিভিন্ন স্থানে গম চাষ করা হয়।

(গম চাষ)

উত্তর গোলার্ধের এই অঞ্চলে ৯০ শতাংশ ভাগ গম চাষ করা হয়। গম থেকে উভয় শ্বেতসার ও পুষ্টিসার পাওয়া যায়। আমেরিকা, রাশিয়া ও অস্ট্রেলিয়ার বিস্তৃর্ণ অঞ্চলে গম চাষ করা হয়। ভারতে গম এক রবি ফসল বা শীতকালীন ফসল। ১০° - ১৫° সেলসিয়াস তাপমাত্রা গম চাষের উপযুক্ত। কিন্তু ফসল কাটার সময় ২০° - ২৫° তাপমাত্রার দরকার হয়। গম উৎপাদনে ভারত এখন স্বনির্ভর দেশের চাহিদা মিটিয়ে বিদেশে গম রপ্তানী করতে আমাদের দেশ সক্ষম হতে পেরেছে। গম উৎপাদনে আশানুরুপ সাফল্যর জন্য দেশে গম বিপ্লব এসেছে। ভারতের গঙ্গা, সত্লেজ সমতল ভূমি গম উৎপদনে মুখ্যঃ পাঞ্জাব, হরিয়ানা, রাজস্থান, উত্তরপ্রদেশে ও মধ্যপ্রদেশ মুখ্য গম চাষ হয়। ওড়িশার কটক, সম্বলপুর ও বালেশ্বর জেলায় গম চাষ হয়।

তোমার কাজ ঃ

রবি ফসল শীতকালে বুনে গ্রীষ্মের আরম্ভে কেটে তোলাকে রবি ফসল বলা হয়।

ধান ঃ ধান পৃথিবীর সর্বাধিক লোকের খাদ্য শস্য। ক্রান্তীয় ও উপক্রান্তীয় অঞ্চলে লোকেদের প্রধান খাদ্য হচ্ছে ভাত। ধান চাষে বেশী জল, উত্তাপ, বৃষ্টি ও আদ্রতার দরকার হয়।

(ধান চাষ)

২৭° - ৩০° সেলিসিয়াস তাপমাত্রা, ১০০-২০০ সেমি. বৃষ্টিপাত, নদী, উপত্যকা ত্রিকোণ ভূমি অঞ্চল।

এঁটেল, পলি ও দোআঁশলা মাটিতে ধান চাষ হয়। চীন ধান উৎপাদনে সারা পৃথিবীতে এক নম্বর। ভারত, জাপানে, শ্রীলঙ্কা ও মিশরে প্রচুর পরিমানে ধান চাষ হয়। ভারত ও বাংলাদেশে বছরে দুতিনবার ধান উৎপন্ন হয়।

তুমি জানো কি?
গ্রীষ্মের প্রারম্ভ বুনে, শীতের আরম্ভতে কেটে তোলা ফসল খরিফ ফসল।

ভারতে ধান মুখ্যত এক খরিফ চাষ। ভারতের প্রায় অধিকাংশ জায়গায় ধান চাষ করা হয়। গঙ্গা, ব্রহ্মপুত্র, মহানদী কাবেরী প্রভৃতি নদী উপত্যকা অঞ্চল ও উপকূলবর্তী অঞ্চলে ধানের চাষ বেশী করা হয়। পার্বত্য অঞ্চলের ঢালু জায়গায় সোপান প্রণালীতে ও ধান চাষ করা হয়। ভারতের উত্তর প্রদেশ, পশ্চিমবঙ্গ, ওড়িশা, অন্ধ্র, তামিলনাড়ু, পাঞ্জাব, উত্তরাখন্ড অঞ্চলে প্রচুর ধান চাষ হয়। ওড়িশার কটক সম্বলপুর, বরগড়, জগৎসিংপুর, কেন্দ্রাপড়া ও যাজপুর জেলা ধান চাষের জন্য পরিচিত।

ধান উৎপাদনে ভারত স্বনির্ভর। নিজের প্রয়োজন মিটিয়ে বাকি ধান বিদেশে রপ্তানী করা হয়। আমাদের দেশে ধান চাষ শ্রমভিত্তিক বৃত্তি হওয়ায় বেশী কর্ম সংস্থানের সুযোগ করে বেকারি দূর করে। ভুট্টা উভয় মানুষের খাদ্য ও পশু খাদ্য রূপে ব্যবহার হয়। তাপমাত্রা ২০° - ৩০° সেলসিয়াস। ৫০-১০০ সে.মি. বৃষ্টিপাত, ক্রান্তীয় জলবায়ু এবং অধিক সূর্য্যালোক ভুট্টা চাষের উপযুক্ত।

(ভুট্টার চাষ)

ভুসভুসে বেলে মাটিতে ভুট্টার চাষ ভালো হয়। দক্ষিণ আফ্রিকার নিগ্রোরা ভুট্টাকে মুখ্য খাদ্যরূপে গ্রহণ করে। আমেরিকা, চীন, ব্রাজিল, আর্জেন্টিনা, মেক্সিকো, রাশিয়া কানাডাতে ব্যাপক চাষ করা হয়। উন্নত মানের বীজ, সার এবং জলসেচন এই চাষের অভিবৃদ্ধি ঘটায় ভুট্টা উৎপাদনে আমেরিকা প্রথম ও চীন দ্বিতীয় স্থান অধিকার করেছে।

ভারতে উত্তর প্রদেশ, বিহার, রাজস্থান ও মধ্যপ্রদেশে ভুট্টা চাষ হয়।

বাজরা ঃ ভুট্টার মতো বাজরাকেও উভয় মানব ও পশুখাদ্য রূপে ব্যবহার করা হয়।

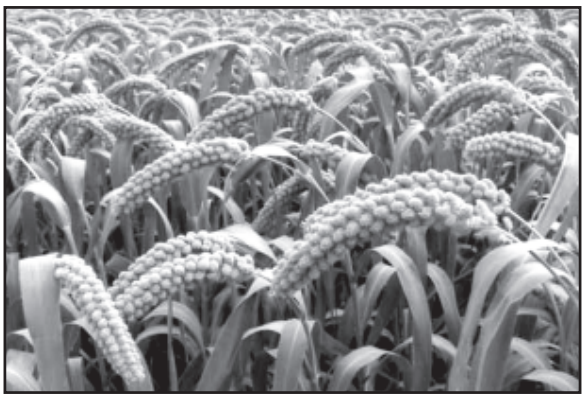
(বাজরার চাষ)

অনুর্ব্বর মাটি, ২৭° - ৩০° সেলসিয়াস তাপমাত্রা ৫০ সেমি. ১২০ সে.মি. বৃষ্টিপাত অঞ্চলে বাজরার চাষ করা হয়। এই চাষে জলসেচ প্রয়োজন হয় না এবং একটি পুস্টিকর খাদ্য শষ্য। আন্তর্জাতিক বাজারে বাজরার চাহিদা বিশেষ নেই। ভারত চীন, নাইজেরিয়া, নাইজার মুখ্য বাজরা উৎপাদনকারী দেশ। ভারতের রাজস্থান এই চাষে প্রধান। এছাড়া কর্নাটক, মহারাস্ট্র, মধ্যপ্রদেশ, উত্তর প্রদেশ গুজরাট ও হরিয়ানা, রাজ্যে বাজরার চাষ খুব ভালো হয়। ওড়িশার গজপতি ও গঞ্জাম জেলায় বাজরা চাষ করা হয়।

তন্তু জাতীয় ফসল ঃ

কার্পাস ও পাট মুখ্য তন্তু জাতীয় ফসল। কার্পাস ঃ ক্রান্তীয় ও উপক্রান্তীয় অঞ্চলে প্রধানতঃ কার্পাসের চাষ করা হয়। এই চাষে বেশী উত্তাপ, জলসেচন ও বৃষ্টিপাতের দরকার হয়। বিভিন্ন মাটিতে এই চাষ করা হলেও, কৃষ্ণ মৃত্তিকা সর্বশ্রেষ্ঠ। পলি, পাঁক ও জৈবসার থাকা মাটিতে কার্পাস চাষ ভালো হয়। আমেরিকা, চীন, ব্রাজিল ও ইজিপ্ট, ভারত এবং পাকিস্তান কার্পাস চাষের প্রধান উৎপন্ন কারী। ইজিপ্টের কার্পাস দীর্ঘ তন্তুযুক্ত। উর্ব্বর মৃত্তিকা, যথেষ্ট সার প্রয়োগ, উত্তম জলসেচন ও সরকারী সাহায্যের সুযোগ হেতু ইজিপ্টে কার্পাস চাষ বেশী হয়। এদেশে প্রতি একরে সর্ব্বোচ্চ ফসল (কার্পাস) উৎপন্ন হয়। তাই রপ্তানীর হিসেবে কার্পাস প্রায় তিন চতুর্থাংশ।

ভারতের তামিলনাড়ুর ত্রিকোণ ভূমি প্রাচীনতম কার্পাস চাষের স্থান। ভারতে সাধারণতঃ ক্ষুদ্র তন্তুর কার্পাস চাষ হয়। মহারাস্ট্র, দাক্ষিনাত্যের উত্তর ও উত্তর পশ্চিমাংশ মধ্যপ্রদেশ, গুজরাট মুখ্য চাষের অঞ্চল। কর্নাটক ও তামিল নাড়ুর কৃষ্ণমৃত্তিকা অঞ্চলের কার্পাস চাষের প্রসিদ্ধ ক্ষেত্র। মুম্বাই, সুরাত, আমেদাবাদে অঞ্চলে প্রচুর কাপড় কল আছে (কেন?) বিদেশে, ভারতে তৈরী জামা প্যান্ট শাড়ী ও মেয়েদের পোষাকের যথেষ্ট চাহিদা রয়েছে।

পাট ঃ পাট স্বর্ণতন্তু নামে পরিচিত। ক্রান্তীয় অঞ্চলে পাট চাষ করা হয় উর্ব্বর মাটি, যথেষ্ট বৃষ্টিপাত ও আদ্র জলবায়ু এই চাষের জন্য প্রয়োজন। বাংলা দেশের নদী প্লাবিত পলিমাটিতে ব্যপক ভাবে পাট চাষ হয়।

বাংলাদেশ ও ভারত প্রধান পাট চাষের দেশ। পশ্চিমবঙ্গ, আসাম, ওড়িশা ও উত্তর প্রদেশে পাট চাষ ভালো হয়। ওড়িশার কটক, যাজপুর, জগৎ সিংহ পুর ও কেন্দ্রপাড়ায় পাটচাষ করা হয়। কোলকাতার হুগলী নদীর তীরে অনেক পাট (চট) কল আছে। ভারতে তৈরী পাটজাত দ্রব্যের বিদেশে খুব চাহিদা রয়েছে। ভারত, পাটের তৈরী বস্তা, সুতলি ও অন্যান্য ব্যবহার উপযোগী দ্রব্য ও বস্তু রপ্তানী করে বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন করে।

পানীয় ফসল ঃ পানীয় ফসলের মধ্যে চা ও কফি প্রধান, পৃথিবীর প্রায় সব দেশেই চা ও কফির চাহিদা রয়েছে।

তোমার কাজ ঃ
কুটির শিল্পে তৈরী পাটজাত দ্রব্য নিয়ে শ্রেণী কক্ষে দেখাও।

চা ঃ পৃথিবীর অধিকাংশ দেশে চা এক প্রধান পানীয় রূপে ব্যবহার করা হয়। এটা এক রোপন কৃষি। পাহাড়ের ঢালু অংশে লাইন করে রোপন করে চাষ করা হয়।

চায়ের চাষ

চায়ের গাছের ওপরের কচি পাতা শুখিয়ে চা পাতা তৈরী করা হয়। উষ্ণ ও আদ্র জলবায়ুতে চায়ের চাষ ভালো হয়। এই চাষ ক্রান্তীয় ও উপক্রান্তীয় জলবায়ুতে বিশেষ ভাবে করা হয়। চায়ের গাছ ভালো বৃদ্ধির জন্যে ২০° থেকে ৩০° সেলিসিয়াস তাপমাত্রা, বর্ষিক ১৫০ সে.মি. থেকে ২০০ সেমি. বৃষ্টির দরকার হয়।

গাছের গোঁড়ায় জল জমে থাকলে গাছ পচে যায়। এই চাষে বেশী শ্রমিকের দরকার হয়।

পৃথিবীতে সর্বপ্রথম চীনদেশে চাকে পানীয় হিসেবে ব্যবহার করা হয়। ইংরেজরা ১৮২৯ সালে প্রথম আমাদের দেশে উত্তর পূর্ব্বাঞ্চলের পার্ব্বত্য ঢালু অংশে এই চাষের প্রচলন শুরু করে। সেই সময় একে আসাম চা বলা হতো। চীন ও ভারত ছাড়াও, শ্রীলঙ্কা, বাংলাদেশ, তাই ওয়ান, ইন্দোনেশিয়া, আর্জেন্টিনা প্রভৃতি দেশে চায়ের চাষ করা হচ্ছে।

ভারতের আসাম ও পশ্চিমবঙ্গে দার্জিলিংয়ের পার্বত্য অঞ্চলে অনেক চায়ের বাগান রয়েছে। দক্ষিণ ভারতের নীলগিরি পর্ব্বতে ও কেরলে চায়ের চাষ করা হয়। চা ভারতের এক প্রধান পন্য দ্রব্য। ভারতীয় চায়ের বিদেশে খুব চাহিদা থাকায়, আমেরিকা, ফ্রান্স, ব্রিটেন, কানাডা অস্ট্রেলিয়া প্রভৃতি দেশে রপ্তানী করা হয়। আজকাল ওড়িশার কলা হান্ডি কন্ধমাল, কোরাপুট ও কেন্দুঝরে চায়ের চাষ আরম্ভ করা হয়েছে।

কফি চাষ

কফি ঃ চায়ের মতো কফিও এক প্রচলিত পানীয়। ক্রান্তীয় মণ্ডলে কফি রোপন করা হয়। কফি চাষ উষ্ণ ও আদ্র জলবায়ু এবং বালি মাটিতে ভালো হয়। ১৮ সেলিসিয়াসে, থেকে ২৮° সেলিসিয়াস তাপমাত্রা, বার্ষিক প্রায় ১৫০ সেমি. ২০০ সে.মি. বৃষ্টিপাত ও ৩৫০ মিটার থেকে ১৮০০ মিটার উচ্চতায়, পাহাড় এর ঢালু অংশে কফির চাষ করা হয়। লাভা বাহিত মাটি, দো আঁসলা ও বালি মাটিতে কফির চাষ ভালো হয়। তীব্র রোদের চাইতে হাল্কা ছাওয়া কফি চাষে দরকার হয়। কিন্তু বর্ষা ও কুয়াশায়কফি চাষের ক্ষতি হয়। ব্রাজিলের সাও পাওলো পৃথিবীর বৃহৎ কফি চাষের অঞ্চল। পেরু, কেনিয়া, আইভরি কোষ্ট, মালাগাসী ফিলিপাইন্স ও কলম্বিয়াতে কফি চাষ করা হয়। পৃথিবীর মোট উৎপাদনের মাত্র ৮ শতাংশ ভারতে উৎপন্ন হয়।

তুমি জানো কি?

৮৫০ সালে আরবের পশুপালক কালাদি কফি গাছের পাতা খাওয়া নিজের পশুদের এক অদ্ভুত আচরণ লক্ষ করলেন। কৌতুহলী হয়ে নিজে কপির ফল খেয়ে এক অদ্ভুত উন্মাদনা অনুভব করলেন। তারপরেই পৃথিবী কফির গুনাগুন জানতে পারল।

কিন্তু ভারতের কফি অতি উৎকৃষ্ট। তাই ইউরোপ ও অস্ট্রেলিয়া মহাদেশে এক চাহিদা বেশী। দক্ষিণ ভারতের কর্ণাটক, তামিলনাড়ু ও কেরলে কফি চাষ করা হয়। কুর্গ, নিলগিরি আন্নামালাই ও মালাবার পার্ব্বত্য অঞ্চলে প্রচুর কফি চাষ করা হয়। ওড়িশার কোরাপুট ও নবরংপুরে কফি চাষের প্রচলন শুরু হয়েছে।

তোমার কাজ ঃ

দৈনন্দিন জীবনে ব্যবহৃত খাদ্য পদার্থের তালিকা প্রস্তুত কর, ও তারমধ্যে থাকা পানীয় দ্রব্যের তালিকা প্রস্তুত কর।

ফসল		পৃথিবীর দেশ	ভারতের রাজ্য	ওড়িশার জেলা
খাদ্য শষ্য	গম	আমেরিকা কানাডা, রাশিয়া, আর্জেন্টিনা ইউক্রেন, ভারত।	রাজস্থান, হরিয়ানা, উত্তর প্রদেশ, মধ্যপ্রদেশ।	কটক, বালেশ্বর
	ধান	চীন, জাপানে মিশর, ভারত, বাংলাদেশ, শ্রীলঙ্কা	পশ্চিমবঙ্গ, উত্তরপ্রদেশ, অন্ধ্র, পাঞ্জাব, হরিয়ানা, উত্তরাখন্ড।	কটক, সম্বলপুর, কেন্দ্রাপাড়া, বরাগড়, জগৎ সিংপুর, বালেশ্বর
	ভুট্টা	আমেরিকা, চীন, ব্রাজীল, মেক্সিকো, কানাডা, রাশিয়া, ভারত	উত্তরপ্রদেশ, পাঞ্জাব, হরিয়ানা, বিহার, রাজস্থান, মধ্যপ্রদেশ, জম্বু ও কাশ্মীর।	গঞ্জাম, অনুগুল, ঢেঙ্কানাল।
	বাজরা	ভারত, চীন, নাইজোরিয়া, নাইজার	হরিয়ানা, গুজরাট, মহারাস্ট্র, রাজস্থান, কর্ণাটক, মধ্যপ্রদেশ।	গজপতি, গঞ্জাম।
তন্তু জাতীয় (ফসল)	কার্পাস (কপা)	আমেরিকা, চীন, পাকিস্তান, ইজিপ্ট, ভারত, ব্রাজিল।	গুজরাট, হরিয়ানা, মহারাস্ট্র, পাঞ্জাব, অন্ধ্রপ্রদেশ।	বলাঙ্গীর, নূয়াপাড়া
	পাট	বাংলাদেশ (ভারত)	পশ্চিমবঙ্গ, আসাম, ওড়িশা, উত্তর প্রদেশ	কটক, যাজপুর, কেন্দ্রাপাড়া, জগৎসিংপুর।
পানীয় ফসল	চা	চীন, জাপান, শ্রীলঙ্কা, ভারত, বাংলাদেশ, দঃ আফ্রিকা, কেনিয়া, ইন্দোনেশিয়া, নিউজিল্যান্ড, আর্জেন্টিনা, অস্ট্রেলিয়া	পশ্চিমবঙ্গ, আসাম, কেরল, তামিলনাড়ু।	কোরাপুট, কালাহান্ডি, কেন্দুঝর কন্ধমাল।
	কফি	ব্রাজিল, পেরু, কেনিয়া, ভারত, মালাগাসী, আইভরিকোস্ট, ফিলিপাইন্স।	কর্নাটক, কেরল, তামিলনাড়ু।	কোরাপুট, নবরঙ্গপুর।

প্রশ্নমালা

১। **নিম্নলিখিত প্রত্যেক প্রশ্নের প্রায় ৫০টি শব্দে উত্তর দাও।**

ক) কৃষি কাকে বলে? চারটি কৃষির উদাহরণ দাও।

খ) কৃষি কর্মকে প্রভাবিত করা উপাদানগুলি উল্লেখ কর।

গ) স্থানান্তরিত কৃষির বিশেষত্বঃ কি?
ভারতের তিনটি স্থানান্তরিক কৃষির নাম ও কৃষিত রাজ্যের নাম লেখ।

ঘ) রোপন কৃষি কাকে বলে? দুটি রোপন কৃষির নাম উল্লেখ কর।

ঙ) দুইটি তন্তু জাতীয় ফসলের নাম লেখ। কি কি প্রাকৃতিক পরিবেশে এই ফসল ভালো উৎপন্ন হয় লেখ।

২। **সংক্ষেপে লেখ ঃ (প্রায় ২০টি শব্দে)**

ক) মিশ্রিত কৃষি।

খ) উদ্যান কৃষি।

গ) সঘন প্রয়োজন ভিত্তিক কৃষি।

৩। **ভৌগোলিক কারণ দেখাও।**

ক) আসামে চা চাষ হয়।

খ) ধান একটি ক্রান্তিমণ্ডলীয় ফসল।

গ) ইজিপ্ট একটি বৃহৎ তুলো রপ্তানী কারক দেশ।

৪। **পার্থক্য দেখাও।**

ক) প্রাথমিক প্রক্রিয়া ও তৃতীয় প্রক্রিয়া।

খ) প্রয়োজন ভিত্তিক কৃষি ও বাণিজ্যিক ভিত্তিক কৃষি।

গ) শুষ্ক কৃষি ও আদ্র কৃষি।

৫। **সংক্ষেপে উত্তর দাও।**

ক) পাট উৎপাদনকারী দুটি দেশের নাম লেখ।

খ) পৃথিবীতে কার্পাস চাষে অগ্রণী চারটি দেশের নাম লেখ।

গ) বাজরা চাষের জন্য প্রয়োজন হওয়া মৃত্তিকা ও জলবায়ুর বিবরণ দাও।

৬। **সঠিক উত্তর বেছে লেখ।**

ক) কোনটা উদ্যান কৃষি?

১) চা চাষ ২) আনাজ চাষ

৩) গো পালন ৪) মৎস্য চাষ।

খ) কোনটি মুখ্য কফি উৎপাদন করা দেশ

১) ব্রাজিল ২) ভারত

৩) কেনিয়া ৪) পেরু।

গ) কোন ফসলটি অন্যদের থেকে ভিন্ন?

১) ধান ২) গম

৩) ভুট্টা ৪) কার্পাস

৭। **প্রাথমিক, দ্বিতীয় ও তৃতীয় কার্য্য সম্পর্কিত ব্যক্তিকে নিম্নের তালিকা থেকে বেছে লেখ।**

- শিক্ষক
- দেশলাইকারখানার শ্রমিক
- ঝুড়ি বুনাকার
- মহাজন
- ফুল চাষী
- মালী
- দুধ বিক্রেতা
- কুমোর
- বার্গী
- মধূ চাষী
- ধর্ম যাজক
- মহাকাশচারী
- ডাক পিয়ন
- কম্পিউটার ইঞ্জিনীয়ার

তোমার কাজ

- অক্টোবর ১৫ তারিখ হচ্ছে বিশ্ব খাদ্য দিবস। সেদিন তোমার বিদ্যালয়ে এক আলোচনা সভার আয়োজন করে এর তাৎপর্য বোঝাও।
- মনে করো তোমার চাষের জমি পাহাড়ের ঢালু অঞ্চলে। তুমি সেখানে কিভাবে চাষ করবে, সে বিষয়ে শ্রেণীতে আলোচনা কর।
- ভারতের মানচিত্রে ধান ও গম চাষের অঞ্চলকে সংকেত দিয়ে বোঝাও।
- পৃথিবীর মানচিত্রে, ধান, গম ও ভুট্টা চাষের অঞ্চলগুলিকে সংকেতের মাধ্যমে দেখাও।

কৃষি উন্নয়ণ

২০১১ সালের গণনা অনুসারে ভারতের জনসংখ্যা প্রায় ১২১ কোটি ছিল। ২০২১ সালে আমাদের দেশের জনসংখ্যা প্রায় ১৪০ কোটি হয়ে যাবে বলে অনুমান করা হচ্ছে। ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাওয়া জনসংখ্যার জন্যে অধিক পরিমাণে খাদ্যের আবশ্যক।

আমাদের সীমিত জমি, জল ও জঙ্গল ব্যবহার করে প্রয়োজন হওয়া অধিক খাদ্য শষ্য উৎপন্নের প্রচেষ্টাকে কৃষি উন্নয়ণ বা কৃষির বিকাশ বোঝায়। কৃষির বিকাশের জন্য কৃষি জমির আকার বৃদ্ধি, বিভিন্ন প্রকারের শষ্য উৎপন্ন, সেচের সুব্যবস্থা, উন্নত কৃষি যন্ত্রপাতির ব্যবহার, নতুন কৃষি কৌশল, রাসায়নিক সার প্রয়োগ, এবং উচ্চ ফলনশীল বীজ ব্যবহার করা প্রয়োজন। কৃষি উন্নয়ণের মূল্য লক্ষ হচ্ছে 'খাদ্য সুরক্ষা'।

তুমি জানো কি?

সুস্থ, নীরোগ ও কর্মঠ জীবন যাপন করার জন্যে প্রত্যেক মানুষের ন্যূনতম পুষ্টি সার খাদ্য প্রয়োজন। এটা পূরণ হতে পারলে খাদ্য সুরক্ষা ব্যবস্থা সম্ভব হতে পারবে।

অধিক জনবহুল বিশিষ্ট দেশগুলিতে ছোট ছোট চাষের জমিতে সঘন প্রণালীতে চাষ করে, প্রয়োজন ভিত্তিক কৃষি কার্য্য করা হচ্ছে। কিছু কিছু জনবহুল দেশে অধিক শষ্য উৎপাদনের জন্য জৈবিক চাষ করা হচ্ছে। যদিও এধরণের দেশের সংখ্যা খুব কম।

তুমি জানো কি?

জৈবিক চাষের জন্য রাসায়নিক সারের বদলে সবুজ সার, জীবাণু সার, পশু, খত্, খোল এবং রাসায়নিক কীটনাশকের বদলে ছাই, নিম ও করঞ্জ, গাছের ছাল, ফুল পাতা, গোমুত্র, কেঁচো ইত্যাদি প্রাকৃতিক ও জৈবিক উপাদান দিয়ে চাষ করা হয়। কৃষির উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য কোনো জিন্ পরিবর্ত্তিত জীবন বা উপাদান ব্যবহার করা হয় না।

আমেরিকা, কানাডা, অস্ট্রেলিয়া প্রভৃতি দেশের চাষের জমি আকারে খুব বড় বড় হয়। তাই ওসব দেশে উন্নত বড় বড় কৃষি যন্ত্রপাতি ও নতুন ধরণের কৃষি উপকরণ দিয়ে প্রচুর শষ্যে ফলানো হয়। তবে ওই কৃষি প্রধানতঃ বাণিজ্য ভিত্তিক।

আজকাল ভারতে পারম্পরিক কৃষির বদলে বেশীর ভাগ নতুন কৃষি কৌশল ও আধুনিক যন্ত্রপাতি দিয়ে চাষ করে বেশী শষ্য উৎপন্ন সম্ভব হচ্ছে।

তুমি জানো কি?

জল উপলব্ধ অঞ্চলে রাসায়নিক সার, কীটনাশক ও উন্নত বীজ এবং কৃষি কৌশল প্রয়োগ করে কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধি করা হয়। এই প্রক্রিয়াকে সবুজ বিপ্লব বলে।

তোমার কাজ ঃ

খাদ্য শষ্যের বিকল্প হিসেব যে সব দ্রব্য খাদ্য রূপে ব্যবহার করা যেতে পারে, তার নাম উল্লেখ কর।

বিকাশশীল দেশ ভারত ও বিকশিত দেশ আমেরিকার কৃষিকার্য্য ও উৎপাদনের বিষয়ে পরের পৃষ্ঠায় আলোচনা করা হয়েছে।

ভারতবর্ষ এক কৃষি প্রধান দেশ, এই দেশের কৃষি অতি প্রাচীন। স্বাধীনতা লাভ করার পরে কৃষির ওপর বেশী গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। ১৯৫১ সালে আরম্ভ হওয়া পঞ্চবার্ষিকী যোজনায় কৃষিকে প্রাধান্য দেওয়া হয়েছিল। কৃষির জমিতে জল যোগানের জন্য দেশের বিভিন্ন প্রান্তে প্রচুর খাল কাটা হয়েছিল।

প্রথম পঞ্চবার্ষিকী যোজনায় ওড়িশায় মহানদীর ওপর নির্মিত হীরাকুদ নদী বাঁধ এর উজ্জ্বল নিদর্শন। দেশে জলসেচের ব্যবস্থা থাকলেও কৃষকরা বৃষ্টি ও উর্ব্বর মাটির ওপর নির্ভর করে চাষ করে। কিন্তু বৃষ্টির অনিশ্চয়তা ও মৃত্তিকার ক্রমানয়ে উর্ব্বরতা হ্রাসের ফলে দেশের উৎপাদন যথেষ্ট হচ্ছে না। তাই, ভারতের কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধি করার জন্য সরকার চকবন্দী, জমিদারী উচ্ছেদ সমবায় চাষ, ইত্যাদি ভুসংস্কার প্রথার আইন প্রস্তুত করল। এছাড়া কৃষকদের উন্নতির জন্য, কৃষিবীমা, গ্রাম্য ব্যাঙ্ক, সমবায় সংস্থা, কম সুদে ঋণ দেওয়া, ও স্বল্পমূল্যে সার ও ওষুধ জুগিয়ে দেওয়ার ব্যবস্থা করা হলো। কৃষিজাত দ্রব্যের ন্যূনতম সহায়ক মূল্য নির্দ্ধারণ করার ফলে জমিতে উৎপন্ন শষ্যের উপযুক্ত মূল্য পেতে কৃষকের সহায়তা হলো। দূর দর্শন ও রেডিওতে আবহাওয়ার পূর্বাভাষ বলে দেওয়ার ফলে চাষের উপযুক্ত যত্ন নেওয়া সম্ভব হলো।

ভারতের কৃষি প্রণালী

তোমার কাজ ঃ তোমার অঞ্চলে চাষের উন্নতির জন্য নেওয়া পদক্ষেপের বিষয়ে শ্রেণীতে আলোচনা কর।

তুমি জানো কি? নতুন কৃষি কৌশল প্রয়োগ করে গম উৎপাদনে সফলতা পাওয়ায় উত্তর ভারতে গম বিপ্লব হয়েছে।

ভারতের উত্তর ও উত্তর পশ্চিমাঞ্চল, বিশেষতঃ পাঞ্জাব ও হরিয়ানায় গম উৎপাদন বেশী হয়। তাই এই অঞ্চলকে ভারতের শষ্যাগার বলা হয়। এখানকার কৃষকেরা উন্নত বীজ ও কৌশল প্রয়োগ করে বছরে অন্ততঃ দুবার ফসল উৎপাদন করে। চাষীর ঋণ নিয়ে ট্রাক্টর দিয়ে চাষ করে ও রাসায়নিক সার এবং জলসেচনের নিয়ন্ত্রণ কৌশল প্রয়োগ করে খুব কম জলে বিভিন্ন ফসল উৎপন্ন করে। ওখানে কৃষি উন্নতি অধিকারীরা চাষীদের বহুল উৎপাদনে যথেষ্ট সাহায্য করেন। বিভিন্ন স্থানে গোদাম থাকায় শষ্য সংরক্ষণে যথেষ্ট সুবিধা হয়। সরকার, কৃষি অধিকারী ও চাষীদের মিলিত চেষ্টার দ্বারা এইসব রাজ্যে সবুজ বিপ্লবের দ্বারা গম বিপ্লব সফলতা লাভ করেছে। পাঞ্জাব ও হরিয়ানা ছাড়াও, রাজস্থান, বিহার, উত্তর প্রদেশ ও মধ্যপ্রদেশে ও প্রচুর গম উৎপন্ন হয়।

বর্তমানে গম উৎপাদনে ভারত এক অগ্রণী দেশ হতে পেরেছে। দেশের চাহিদা মিটিয়ে বিদেশে গম রপ্তানী করতে দেশ সক্ষম হয়েছে। কৃষি ছাড়াও ভারতের চাষীরা গোপালন ও মুর্গি চাষ করে লাভবান হচ্ছে। চাষীর বিভিন্ন সমবায় সমিতির সভ্য হয়ে এই সংস্থার সাহায্যে দুধ ও ডিম বিক্রী করে লাভবান হতে পারছে।

তোমার কাজ ঃ ভারত থেকে রপ্তানী হওয়া কৃষিজাত পন্যের তালিকা তৈরী করে শ্রেণী কক্ষে দেখাও।

আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের কৃষি

আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের চাষের জমির আকার প্রায় ভারতের চাষের জমির কয়েকগুণ বেশী হয়ে থাকে। আমেরিকার একটি সাধারণ কৃষি জমি ২৫০ হেক্টর এর তুলনায় ভারতের ১.৫ হেক্টর।

জেনে রাখো ঃ
১ হেক্টর - ২.৪ একর

আমেরিকায় কৃষিকে এক শিল্পরূপে গণ্য করা হয়। এদেশে জমি চাষ, বীজবোনা, ফসল কাটা, সার ও ওষুধ প্রয়োগ করা সবই যান্ত্রিক উপায়ে করা হয়।

আমেরিকার কৃষক শিক্ষিত ও কৃষির প্রতি যত্নবান। চাষের পূর্বে মৃত্তিক পরীক্ষা আগারে নিয়ে মাটি পরীক্ষা করে সেই অনুসারে রাসায়নিক সার প্রয়োগ করে।

চাষীরা আজকাল চাষের জন্য কম্পিউটার ব্যবহার করে। তাদের কম্পিউটার উপগ্রহের সঙ্গে সংযুক্ত থাকে। ফলে তার জমির মাটি ফসল উৎপাদনে কত উপযোগী, সেটা সে জানতে পারে।

রোগ ও পোকামাকড়ের হাত থেকে ফসল রক্ষা করার জন্য প্রয়োজনে হেলিকপ্টার দিয়ে আকাশ থেকে কীটনাশক ওষুধ ছড়িয়ে চাষকে রক্ষা করে। দেশে যথেষ্ট গোদাম ও বাণিজ্যিক সংস্থা থাকায় ফসল সংরক্ষণ করে ও ভালো দামে বিক্রী করে যথেষ্ট লাভ করে। যুক্তরাস্ট্র আমেরিকার একজন চাষী সাধারণ কৃষকের পরিবর্ত্তে বাণিজ্যিক ব্যবসায়ী হিসেবে জমিতে চাষ করে। আমেরিকার কৃষি প্রধানতঃ

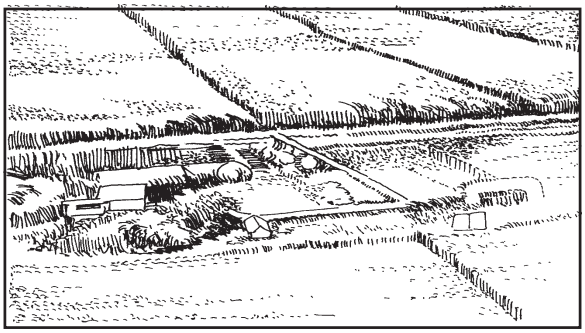

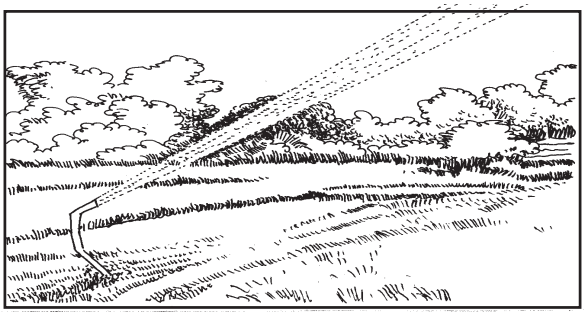

বাণিজ্য ভিত্তিক। খাদ্য শষ্য রপ্তানীতে পৃথিবীর অগ্রণী দেশ। কৃষি দ্রব্যের মধ্যে গম, ভুট্টা তুলো তামাক পাতা ও সোয়াবিন প্রধান। ভুট্টা (মকা) উৎপাদনে যুক্তরাস্ট্র আমেরিকা পৃথিবীতে এক নম্বর ও গম উৎপাদনে দ্বিতীয় স্থানে রয়েছে। কানাডার প্রেইরীর দক্ষিণ অঞ্চলে আমেরিকার গম চাষের অঞ্চল এখানে গ্রীষ্ম ঋতুতে গম বোনার পর শীতকালে ফসল সংগ্রহ করা হয়। লোহিত নদী উপত্যকার বৃহৎ সমতল অঞ্চলে বসন্তকালে গম বুনে গরমকালে কাটা হয়। গম উৎপন্ন হওয়ার পর প্রায় এক বছর জমি ফাঁকা ফেলে রাখা হয়। (কেন?)

(ভুট্টা বলয়) হিসেবে পরিচিত আমেরিকার মধ্য পশ্চিম অঞ্চল ব্যাপক ভুট্টা চাষের জন্য বিখ্যাত। পৃথিবীর মোট ভুট্টা উৎপাদন এর ৫০ ভাগ কেবল আমেরিকায় উৎপন্ন হয়। সবুজ ধূসর, লাল, হলুদ প্রভৃতি বিভিন্ন রংয়ের ভুট্টা এদেশে উৎপন্ন হয়। ভুট্টা প্রধানতঃ পশু খাদ্যরূপে ব্যবহৃত হয়। এতে বেশী স্বেতসার থাকার দরুণ, গোরু, শুয়োর, ভেড়া প্রভৃতি পশুরা খেয়ে খুব হৃষ্টপুষ্ট হয় এবং ওদের

(ড্রোনের সাহায্যে কীটনাশক প্রয়োগ)

কেটে মাংস বিদেশে রপ্তানী হয়। শিকাগো শহর মাংস ব্যবসার প্রধান কেন্দ্র। পশু ও মানব খাদ্য ব্যাতীত। খাবার তেল, কলকব্জার তেল, সাবান, সিরাপ, চিনি, অ্যালকোহল, স্পিরিট, রঙ ও জ্বালানি প্রভৃতি তৈরীতে ভুট্টা ব্যবহার করা হয়। মিসিসিপি নদীর অববাহিকার দক্ষিণাংশ তুলো (কার্পাস) চাষের জন্য বিখ্যাত। মেক্সিস্ পৃথিবীর বৃহত্তম তুলো ব্যবসায়ের কেন্দ্র। কৃষির মতো পশু সম্পদও আমেরিকার গুরুত্বপূর্ণ সম্পদ। বৃহৎ হ্রদ নিকটবর্ত্তী অঞ্চলে গোরু, ভেঁড়া, শুয়োর ইত্যাদি পালন করা হয়। উইস্কনসিন রাজ্যকে আমেরিকার Dairy land বা পশুপালন ভূমি বলা হয়। এই রাজ্য দুধ, ননী, মাখন ও ছানার প্রধান ব্যবসা কেন্দ্র।

ফ্লোরিডার উত্তরাঞ্চল স্ট্রবেরী, কমলালেবু, আনারস, লিচু ইত্যাদি ফল চাষের জন্য বিখ্যাত। দেশের কৃষির উন্নতির জন্যে, কৃষি ঋণ, কৃষি পণ্যের সহায়ক মূল্য নির্দ্ধারণ, সাবসিডি ও কৃষি গবেষণার জন্য আর্থিক সাহায্যের ব্যবস্থা রয়েছে। আমেরিকায় কৃষি কার্য্য খুব কষ্টকর বলে বিবেচনা করা হয়।

এক সমীক্ষায় জানা গেছে যে ১৯৯২ থেকে ২০০৫ সালের মধ্যে ৫১৬ জন কার্য্যরত কৃষি শ্রমিক মৃত্যুবরণ করেছিল। তাই কৃষক ও কৃষি শ্রমিকদের নিরাপত্তা ও স্বাস্থ্যের সুরক্ষার জন্যে সরকারী স্তরে বিভিন্ন কার্য্যকারী ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে।

তোমার কাজ ঃ বই, পত্রিকা, খবরের কাগজ ও ইন্টারনেট থেকে ভারত ও আমেরিকার কৃষকদের জীবন শৈলীর ওপর এক টিপ্পনী লেখ।

প্রশ্নমালা

১। **নিম্নলিখিত প্রত্যেক প্রশ্নের উত্তর প্রায় ৫০টি শব্দে লেখ।**

ক) কৃষি উন্নয়ণ বলতে কি বোঝায়? এর প্রধান লক্ষ কি?

খ) ভারতে কৃষির উন্নতিতে সরকারী স্তরে কি কি পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে?

গ) আমেরিকার কৃষি খামারের ওপর আলোচনা করে বলো।

ঘ) আমেরিকার ভুট্টাকে মাংস হিসাবে বিক্রী করা হয়। এর তাৎপর্য্য বোঝাও।

২। সংক্ষেপে লেখ (প্রায় ২০টি শব্দে)

ক) জৈবিক চাষ

খ) খাদ্য সুরক্ষা

গ) গম বিপ্লব

৩। সঠিক উত্তর বেছে লেখ।

ক) কৃষি উন্নয়নের মূল লক্ষ কি?

১) প্রচুর জল সেচের ব্যবস্থা।

২) কৃষি জমির আয়তন বৃদ্ধি।

৩) উন্নত বীজের ব্যবহার।

৪) খাদ্য সুরক্ষা।

খ) কোন শষ্য আমেরিকায় ব্যাপক চাষ হয় না?

১) ভুট্টা

২) গম

৩) পাট

৪) কার্পাস (তুলো)

গ) ভারতের কৃষি মুখ্যতঃ

১) বাণিজ্যিক

২) প্রয়োজন ভিত্তিক

৩) সঘন মিশ্রিত চাষ

৪) বাজার উদ্যান ভিত্তিক।

৪। বন্ধনীর ভেতর থেকে উপযুক্ত শব্দ বেছে শূণ্যস্থান পূরণ কর।

ক) প্রথম পঞ্চবার্ষিক যোজনাকালে------- উন্নতির প্রতি গুরুত্ব দেওয়া হয়েছিল।

১) শিল্প

২) কৃষি

৩) যোগাযোগ

৪) পরিবহন

৫) খনিজ ও শক্তি সম্পদ

খ) ওড়িশার হীরাকুদ নদীবাধ নির্মাণ------ পঞ্চবার্ষিক যোজনায় করা হয়েছিল।

১) প্রথম

২) দ্বিতীয়

৩) তৃতীয়

৪) চতুর্থ

গ) গম উৎপাদনে আমেরিকা পৃথিবীতে —— স্থান অধিকার করেছে।

১) প্রথম

২) দ্বিতীয়

৩) তৃতীয়

৪) চতুর্থ

ঘ) আমেরিকা যুক্তরাস্ট্রে —— শষ্য মুখ্যতঃ পশু খাদ্য রূপে ব্যবহার করা হয়ে থাকে

১) গম

২) বাজরা

৩) ভুট্টা

৪) যব।

৫) 'ক' তালিকায় দেওয়া কৃষি দ্রব্যের সঙ্গে সম্পৃক্ত 'খ' তালিকায় থাকা প্রধান কৃষি অঞ্চলদের থেকে ঠিক উত্তর বেছে লেখো।

	'ক' তালিকা	'খ' তালিকা
ক)	কার্পাস	লোহিত নদী উপত্যকা
খ)	গম	বৃহৎ হ্রদ অঞ্চল
গ)	ভুট্টা	মিসিসিপি নদী
ঘ)	ফল	অববাহিকার দক্ষিণাঞ্চল আমেরিকার মধ্য পশ্চিমাঞ্চল ফ্লোরিডার উত্তরাঞ্চল।

৬) যুক্তরাস্ট্র আমেরিকার কৃষি ও ভারতের কৃষি ঃ

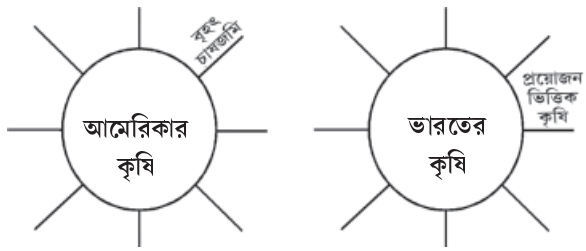

উপরোক্ত সূর্য্য চিহ্ন দেওয়া ছবিতে আমেরিকা ও ভারতের কৃষি সম্বন্ধীয় শব্দ দিয়ে পূরণ কর। পরিশেষে এই শব্দমালা ব্যবহার করে দুই দেশের কৃষির ওপর সংক্ষিপ্ত বিবরণী লিখে শ্রেণীতে দেখাও।

৭) উত্তর আমেরিকা মহাদেশের মানচিত্রে দেশের (যুক্তরাস্ট্র) সীমা চিহ্নিত কর এবং গম ও ভুট্টা চাষের অঞ্চলগুলি চিহ্ন দিয়ে দেখাও।

চতুর্থ অধ্যায়

শিল্প

তুমি পড়তে থাকা এই বইটি কিসব প্রক্রিয়ার মাধ্যমে তোমার কাছে পৌঁছেছে সেটা কখনও ভেবেছো কি? প্রথমে কাগজ তৈরী হয়েছে। কাগজের ওপর পড়া ও ছবি ছাপা হয়েছে এবং পরে বাঁধাই করে পুস্তকের আকারে প্রকাশিত হয়েছে। এক সুদীর্ঘ প্রক্রিয়া করণের মাধ্যমে একটি সম্ভব হয়েছে।

এই প্রক্রিয়া যাত্রার শুভারম্ভ গাছ থেকেই শুরু হয়েছে। প্রথমে গাছ কেটে কাগজ কলে নিয়ে আসা হয়েছে। সেখানে কাঠকে চটকে পিন্ড তৈরী করে তার সঙ্গে কিছু রাসায়নিক পদার্থ মিশিয়ে নরম পাতলা চাদর তৈরী করে কাগজ হয়েছে। তারপর ছাপা খানায় নিয়ে রাসায়নিক কালিতে ছেপে তার সঙ্গে ছবি ও মানচিত্র ছেপে সাইজ মতো কেটে বাঁধাই করে পুস্তক করা হয়েছে এবং সেটা বাজারে দোকানের মাধ্যমে তোমার কাছে এসেছে।

বাস্তবে প্রকৃতির কাছ থেকে পাওয়া প্রত্যেক জিনিষ প্রত্যক্ষ ভাবে ব্যবহার করার উপযুক্ত নয়। কিন্তু যেগুলি প্রত্যক্ষ ভাবে ব্যাবহার করা যায়, সেগুলি প্রাথমিক উৎপাদন বলে গন্য হয়। যেমন ঃ ফুল, ফল, মধু ইত্যাদি। বাকী সব বিভিন্ন প্রক্রিয়াকরণের মাধ্যমে ব্যাবহার উপযোগী হয়। তাই শিল্প বা দ্বিতীয় কার্য্যকলাপ কাঁচামালকে লোকেদের জন্যে উপযুক্ত ব্যবহার উপযোগী দ্রব্যে পরিণত করে থাকে উপরোক্ত আলোচনা চর্চা করে বোঝা গেল যে কাঠের নরম পিন্ড থেকে কাগজ এবং তা থেকে বই তৈরী হয়। অর্থাৎ এই প্রক্রিয়া (পিন্ড থেকে কাগজ ও কাগজ থেকে বই) দুটি পর্য্যায় ভুক্ত। কাগজ তৈরী হওয়া বা সুতো থেকে কাপড় তৈরী হওয়ার প্রতিটি প্রক্রিয়ার প্রত্যেক পর্য্যায় এ সবের মূল্য বৃদ্ধি পেয়ে থাকে। লোহা পাথর যখন ইস্পাতে পরিণত হয়, তখন এর উপযোগিতা ও মূল্যতে বৃদ্ধি ঘটে থাকে ইস্পাত থেকে যখন কলকব্জা বা দ্রব্য (ঘড়ি ইত্যাদি) তৈরী হয়, তখন এর মূল্য আরও বেড়ে যায়। তাই কাঁচামাল অপেক্ষা তুলনায় তৈরী হওয়া দ্রব্যের উপযোগীতা ও মূল্য বেশী হয়।

তোমার কাজ ঃ তুমি পরে থাকা সূতীর জামাটা তুলো থেকে সুতো এবং সুতো থেকে জামায় পরিণত হওয়ার সম্পূর্ণ প্রক্রিয়া বর্ণনা কর।

বিভিন্ন শিল্প সংস্থায় বা কারখানায় কাঁচামাল থেকে প্রয়োজনীয় সামগ্রী প্রস্তুত করা হয়।

যে অর্থনৈতিক কার্য্যকলাপের দ্বারা খনিজ পদার্থের উত্তোলন, নতুন সামগ্রী প্রস্তুত করা এবং সেবা প্রদান করা হয় তাকে 'শিল্প' বলে। যেমন - লৌহ ইস্পাত শিল্পে বিভিন্ন সামগ্রী তৈরী করা হয়, কয়লা খনন শিল্পে কয়লা উত্তোলন করা হয়। এবং পর্য্যটন শিল্পে বিভিন্ন প্রকার সেবা প্রদান করা হয়। তাই পরিবহন যোগাযোগ প্রভৃতি সেবাকে শিল্পের আওতায় আনা হয়েছে। শিল্পের দ্বারা লোকের কর্ম সংস্থান বাড়ে, ব্যবসা বানিজ্য বৃদ্ধি পায় এবং দেশের আয় বৃদ্ধি হয়। একজন শিল্প শ্রমিক চাষীর থেকে বেশী উপার্জন করে।

শিল্পায়ন দেশের অর্থনীতিকে সমৃদ্ধ্য করে।

মনে রেখো ঃ
শিল্পায়ন ঃ বিভিন্ন প্রকার শিল্পের প্রতিষ্ঠার দ্বারা দেশের অর্থনীতির বিকাশকে 'শিল্পায়ন' বলা হয়।

শিল্পের শ্রেণী বিন্যাস ঃ কাঁচামাল, আকার প্রকার ও মালিকানার ভিত্তিতে শিল্পকে বিভিন্ন শ্রেণীতে ভাগ করা হয়। কাঁচা মালের পরিপ্রেক্ষিতে শিল্পকে কৃষি ভিত্তিক, খনিজ ভিত্তিক, জঙ্গল ভিত্তিক ও সমুদ্রভিত্তিক শিল্পে ভাগ করা হয়। কৃষি ভিত্তিক শিল্পেতে উদ্ভিদ ও প্রাণীকে কাঁচামাল হিসেবে ব্যবহার করা হয়। খাদ্য প্রক্রিয়াকরণ, খাবার তেল, কার্পাস, বয়ন, দুগ্ধজাত পদার্থ ও চর্ম প্রক্রিয়া ইত্যাদি কৃষিভিত্তিক শিল্পের উদাহরণ। খনিজ ভিত্তিক শিল্প মৌলিক শিল্প রূপে পরিচিত। বিভিন্ন খনিজ পদার্থকে কাঁচামাল রূপে ব্যবহার করে উৎপাদিত সামগ্রী অন্য শিল্পে কাঁচামাল হিসেবে ব্যবহার করা হয়। যেমন লোহা পাথর থেকে লোহা বের করে যন্ত্রপাতি, জাহাজ, গাড়ী ইত্যাদি প্রস্তুত করা হয়।

সমুদ্র ভিত্তিক শিল্পে সমুদ্রে থেকে পাওয়া বিভিন্ন পদার্থকে কাঁচামাল হিসেবে ব্যবহার করা হয়। যেমনঃ সামুদ্রিক খাদ্য ও সামুদ্রিক মাছের ও প্রাণীর তৈল উৎপাদন এর উদাহরণ।

জঙ্গল ভিত্তিক শিল্পে জঙ্গল থেকে পাওয়া বিভিন্ন পদার্থকে কাঁচামাল হিসেবে ব্যবহার করা হয়। কাগজ, ঔষধ, আসবাব ও বিভিন্ন গৃহনির্মাণ শিল্পগুলি মূলতঃ জঙ্গল জাত পদার্থের ওপর নির্ভর করে। উপভোক্তারা প্রত্যক্ষ ভাবে ব্যাবহার করার শিল্পকে উপভোক্তা উৎপাদনকারী শিল্প বলা হয়। যথাঃ পাউরুটি, বিস্কুট, তেল, চা, সাবান, রেডিও, টেলিভিশান ইত্যাদি।

আকার ঃ

শিল্পের আকার বলতে এতে বিনিয়োগ করা পুঁজি, শ্রমিক সংখ্যা ও উৎপাদনের পরিমাণ বোঝায়। আকারের নিরীখে শিল্পকে দুভাগে যথা। বৃহৎ শিল্প ও ক্ষুদ্র শিল্পে ভাগ করা হয়। কুটির শিল্পে ও ক্ষুদ্র শিল্পের অন্তর্গত। এখানে কারিগর বা পরিবারের লোকেরা হাতে করে বিভিন্ন সামগ্রী তৈরী কবে থাকে। ঝুড়ি বোনা, মাটির হাঁড়ি কলসি করা এবং অন্যান্য ছোট খাটো, হস্ত শিল্প কুটির শিল্পের অন্তভুক্ত।

ক্ষুদ্রশিল্পের উদাহরণ — ঘড়ি, রেডিও, টেলিভিশান ইত্যাদি। ক্ষুদ্র শিল্পে অল্প পুঁজি ও সীমিত প্রযুক্ত বিদ্যার ব্যবহার হয়।

বৃহৎ শিল্পে অনেক বেশী পুঁজি। উন্নত প্রযুক্তির দরকার হয়। মটর গাড়ী, বড় ও ভারী যন্ত্রপাতি নির্মাণ বৃহৎ শিল্পের অন্তর্গত।

মালিকানা ঃ

মালিকানা হিসেবে শিল্প সংস্থাকে ব্যক্তিগত, সরকারী, দ্বৈত ও সমবায় সংস্থায় বিভাজন করা হয়েছে। কোনো ব্যাক্তি বা একাধিক ব্যাক্তির মিলিত মালিকানায় চলা শিল্পকে ব্যক্তি মালিকানা শিল্প বলা হয়। যেমন - টাটা ইস্পাত কারখানা। সরকারের হাতে থাকা সংস্থাগুলি সরকার পরিচালনা করে। যেমন - হিন্দুস্থান এ্যারোনটিক্স ও ভারতীয় ইস্পাত নিগম।

দ্বৈত্ব মালিকানা ভুক্ত সংস্থাগুলি সরকার ও ব্যাক্তিগত উভয় মালিকানায় পরিচালিত হয়।

মারুতি উদ্যোগ এর এক প্রকৃষ্ট উদাহরণ।

সমবায় শিল্পে সংস্থাগুলি কাঁচা মাল উৎপাদক বা যোগানদার শ্রমিক উভয়ের মালিকানায় পরিচালিত হয়। সম্বলপুরী তাঁত শিল্প ও আমুল দুধ উৎপাদক সংস্থা এই সমবায় মালিকানার প্রকৃষ্ট উদাহরণ। শিল্প সংস্থার অবস্থিতি কে প্রভাবিত করার কয়েকটি কারকঃ কোনো স্থানে শিল্পানুষ্ঠান গড়ে ওঠার অনেকগুলি কারক থাকে, যেমন ঃ কাঁচামালের প্রাচুর্য্য, জমি, জল, শ্রমিক, শক্তি, পুঁজি, যাতায়াতের সুবিধা, ও বাজারের উপলব্ধি ইত্যাদি বেশ গুরুত্বপূর্ণ। এইসব কারক সহজে উপলব্ধ স্থানে শিল্প প্রতিষ্ঠান গড়ে ওঠে। অনুন্নত স্থানে শিল্প গড়ে তোলার জন্য সরকার থেকে অনেক প্রকার সুযোগ সুবিধা ও সাহায্য করা হয়। শিল্পায়নই বহুক্ষেত্রে শহর ও নগর বিকাশ ও অভিবৃদ্ধির সহায়ক হয়।

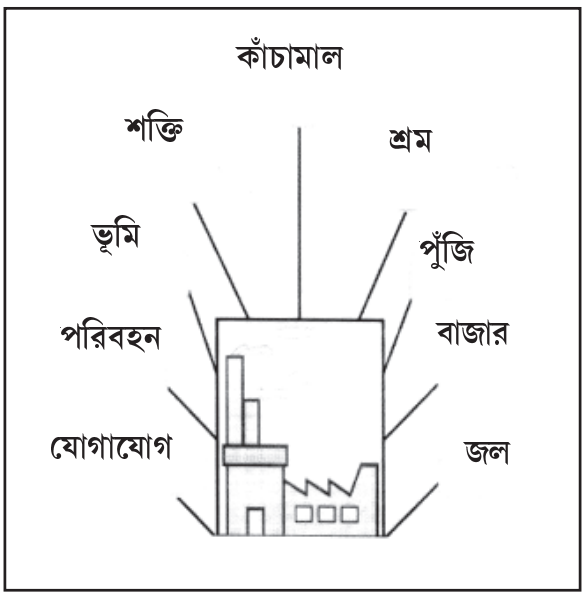

শিল্প প্রতিষ্ঠিত করার সকল ব্যবস্থা ঃ শিল্প এক নিবেশ প্রক্রিয়া ও উৎপাদন নিয়ে গড়া। নিবেশ বলতে কাঁচা মাল, শ্রমিক, জমি, পরিবহন, শক্তি ও অন্যান্য সেবার ব্যবস্থা এবং বিকাশের জন্য নিবেশিত পুঁজিকে বোঝায়।

তোমার কাজ ঃ
একটি চামড়ার জুতোর জন্যে কি কি নিবেশ প্রক্রিয়া ও উৎপাদনের প্রয়োজন হয় হয় সেগুলি লেখ।

আধারিত সংরচনা ঃ বৈদ্যুতি করণ, যোগাযোগ, সড়ক ও রেল পথ, শিক্ষানুষ্ঠান চিকিৎসালয় ইত্যাদি ব্যবস্থাকে আধারিত সংরচনা বলা হয়। উৎপাদন দক্ষতা ও অভিবৃদ্ধির বিকাশের জন্য এদের প্রসার অত্যন্ত জরুরী। শিল্প সংস্থায় কাঁচামাল থেকে উৎপাদিত দ্রব্যের সৃষ্টির জন্য যেসব পন্থা অবলম্বন করা হয়, তাকে প্রক্রিয়া করণ বলে। শিল্প সংস্থা থেকে সবশেষে নির্গমন হওয়া উৎপাদিত দ্রব্যকে উৎপাদন বলা হয় এবং এর থেকে যথেষ্ট আয় হয়। একটি বস্ত্র শিল্পে তুলো, মানব শ্রম, যন্ত্রপাতি, ও পরিহন খরচা প্রভৃতি নিবেশ করতে হয়। তুলোধোনা, সুতো কাটা কাপড় বোনা, রং দেওয়া, ছাপানো ও সেলাই প্রভৃতি প্রক্রিয়া এক একটি পর্য্যায়। তোমার পরনের ড্রেস একটি উৎপাদক।

কাছাকাছি গড়ে ওঠা অনেক শিল্প সংস্থা পরস্পরের নিকটবর্তী হওয়ার সুবিধে পেয়ে শিল্পোঞ্চল গড়ে ওঠে।

পৃথিবীর বিখ্যাত শিল্পাঞ্চলগুলির মধ্যে আমেরিকার পূর্বাংশ, পশ্চিম ও কেন্দ্রীয় ইউরোপ, পূর্ব ইউরোপ ও পূর্ব এশিয়া বিখ্যাত প্রধান শিল্পাঞ্চলগুলি, নাতিশীতোষঅণ অঞ্চল, সামুদ্রিক বন্দর ও বিশেষ করে কয়লা পাওয়া যাওয়া অঞঅচলে গড়ে উঠেছে। ভারতেও অনেক শিল্পাঞ্চল গড়ে উঠেছে। সেগুলির মধ্যে মুম্বাই পুনে শিল্পাঞ্চল। বেঙ্গালুরু তামিলনাড়ু অঞ্চল, হুগলী অঞ্চল,

আহমোদাবাদ ভদোদরা অঞ্চল, ছোটনাগপুর অঞ্চল গুরগাঁও দিল্লী মীরাট অঞ্চল এবং কোলাম থিরু অন্তপুরম প্রভৃতি বিখ্যাত।

শিল্প দুর্ঘটনা ঃ শিল্প সংস্থায় মুখ্যতঃ প্রযুক্তি কৌশলের বিফলতা মারাত্মক পদার্থের অপ ব্যবহার ও দায়িত্বহীনতার কারণে নানা দুর্ঘটনা ঘটে থাকে। আজ পর্য্যন্ত ঘটে যাওয়া, ১৯৮৪ সালে ৩ ডিসেম্বর মধ্যরাতে ভোপাল গ্যাস দূর্ঘটনা সবচেয়ে মমর্ন্তুদ শিল্প দূর্ঘটনা। প্রযুক্তি কৌশলের বিকলতা এবং অবহেলার জন্য এখানে থাকা ইউনিয়ন কার্বাইড্ কীটনাশক কারখানা থেকে অতি বিষাক্ত মিথাইল আইসো সাইনেট, হাইড্রোজেন সাইনাইড ও অন্যান্য ক্ষতিকারক গ্যাস বায়ুমণ্ডলে মিশে যায়। ফলে প্রায় ৪ হাজার লোকের মৃত্যু হয় মৃত্যুর হাত থেকে বেঁচে যাওয়া হাজার হাজার লোক এখনও অন্ধত্য, প্রতিরোধ শক্তিহীন ও বিভিন্ন ধরণের পেটের রোগে পিড়ীত হয়ে ভুগছে।

২০০৫ ২৩শে ডিসেম্বর, চীনের চোঙ্গিঙ্গ অন্তর্গত পাও কিয়াও স্থানে গ্যাসের কুঁয়ো বিস্ফোরেনে ২৪৩ জনের মৃত্যু হয়। এছাড়া প্রায় ৯০০০ লোক আহত হয় এবং ৬৪০০০ লোককে স্থানান্তরিত করা হয়। বিস্ফোরণের পরে দৌড়ে পালাতে না পারা লোকেরাই মারা যায়। যারা ঠিক সময়ে স্থল ত্যাগ করতে পারলো না, তাদের চোখ, চামড়া ও ফুসফুস ঝলসে গেল।

পৃথিবীর মানচিত্র

দুর্ঘটনা রোধ এবং হ্রাস করার জন্যে কিছু পদক্ষেপঃ

১। শিল্পাঞ্চলকে জনবসতি স্থান থেকে দূরে স্থাপন করা উচিৎ।

২। কলকারাখানার নিকটে বসবাস কারীদের শিল্পে ব্যাবহৃত বিষাক্ত পদার্থের প্রভাব ও দূর্ঘটনা ঘটলে কিভাবে আত্মরক্ষা করা হবে সে বিষয়ে জানিয়ে রাখা।

৩। অগ্নি সতর্কতা ও অগ্নি-নির্বাপন ব্যবস্থার উন্নতি করা প্রয়োজন।

৪। বিষাক্ত পদার্থের জমায়েত সীমিত রাখা প্রয়োজন।

৫। শিল্পানুষ্টানে হঠাৎ দূষণ হলে সঙ্গে সঙ্গে তার অপসারণ ব্যবস্থায় উন্নতি ঘটানো জরুরী।

প্রধান শিল্প সংস্থাগুলির বিতরণ ঃ পৃথিবীর প্রধান শিল্প সংস্থার মধ্যে ইস্পাত, কার্পাস সূচনা ও প্রযুক্তি বিদ্যা শিল্প উল্লেখযোগ্য। ইস্পাত ও কার্পাস শিল্প বেশ পুরোনো হলেও সূচনা প্রযুক্তি বিদ্যা শিল্প নতুন অবদান।

তুমি জানো কি? নতুন, ভাবে গড়ে ওঠা শিল্পকে সূর্য্যোদয় শিল্প আখ্যা দেওয়া হয়েছে। সূচনা বিদ্যা, স্বাস্থ্য ও সেবা, আতিথ্য এবং শিক্ষাকে এর অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।

জার্মানী, আমেরিকা, চীন, জাপান ও রাশিয়াতে বৃহৎ বৃহৎ লৌহ-ইস্পাত কারখানা গড়ে উঠেছে। বয়ন শিল্প, ভারত, দক্ষিণ কোরিয়া, জাপান ও তাইওয়ান প্রভৃতি দেশে বেশী দেখা যায়। সূচনা প্রযুক্তি বিদ্যার প্রমুখ ক্ষেত্র রূপে আমেরিকার ক্যালির্ফোনিয়ার সিলিকণ উপত্যকা ও ভারতের বেঙ্গালুরু উল্লেখযোগ্য।

লৌহ ইস্পাত শিল্প ঃ

অন্যান্য শিল্পের মতো এই শিল্পেও পুঁজি নিবেশ, প্রক্রিয়াকরণ এবং উৎপাদন আছে। এটা এক মৌলিক শিল্প। এর উৎপাদনকে অন্যান্য শিল্পে কাঁচামাল হিসেবে ব্যবহার করা হয়। এই শিল্পে কাঁচামাল হিসেবে লোহা, পাথর, কয়লা, চূনা পাথর ইত্যাদির সঙ্গে কায়িক শ্রম, পুঁজি, জমি এবং অন্যান্য প্রয়োজন নিবেশ করা হয়।

লোহাপাথর অনেক প্রকার প্রক্রিয়া দ্বারা ইস্পাতে পরিণত হয়। প্রথমে একে ব্লাষ্ট ফার্নেসে গলানো হয়, পরে শুদ্ধকরণ দ্বারা বিশুদ্ধ করে ইস্পাত পাওয়া যায়। এই ইস্পাত অন্যান্য শিল্পে কাঁচামাল হিসেবে ব্যবহার হয়।

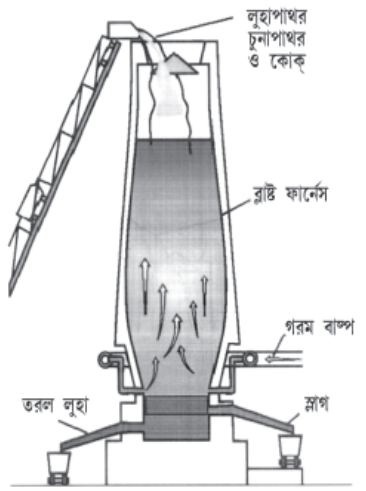

ব্লাস্ট ফার্নেসে ইস্পাত উৎপাদন

ইস্পাত বেশ শক্ত এবং একে চট্ করে বিভিন্ন আকার দেওয়া যায়, কাটা যায় এবং তার তৈরী করা যায়। এর সঙ্গে ম্যাঙ্গানীজ, নিকেল ও ক্রোমিয়াম জাতীয় ধাতু কিঞ্চিত পরিমাণে মিশিয়ে স্বতন্ত্র ইস্পাত তৈরী করা হয়। একে মিশ্র ধাতু বলে। এই ধরণের ইস্পাত বেশী শক্ত ও মজবুত হয় এবং প্রায় মরিচা বিহীন হয়। ইস্পাত আধুনিক শিল্পের মেরুদন্ড সম।

আমাদের ব্যবহৃত প্রায় অধিকাংশ জিনিস লৌহ ইস্পাতে তৈরী বা ইস্পাতের তৈরী কল কব্জার দ্বারা তৈরী। জাহাজ, বাস, লরি, সাইকেল, অটো প্রভৃতি এবং রেলগাড়ী ত লৌহ ইস্পাতে তৈরী। এমনকি ছুঁচ, পিন, ক্লিপ, সেফটিপিনও ইস্পাতের তৈরী। তৈলখনি খননের কাজ, আধুনিক কৃষির কাজ সবই লৌহ ইস্পাতের দ্বারা হয়। এমন কি আধুনিক বড় বড় বাড়িগুলিও ইস্পাতের কাঠামোর ওপরেই গড়ে ওঠে।

১৮০০ সালের আগে কাঁচামাল, শক্তি যোগান ও স্বচ্ছ পরিষ্কার জল প্রবাহিত স্থানের কাছাকাছি ইস্পাতের কারখানা গড়ে উঠেছিল। পরে কয়লা খনি, খাল ও রেলপথের সুবিধা থাকা স্থানগুলো বিবেচিত হলো। ১৯৫০ সাল থেকে সমুদ্র বন্দরের কাছাকাছি বিস্তীর্ণ অঞ্চলে ইস্পাত কারখানা প্রতিষ্ঠিত হোলো কারণ এই সময় কারখানার আয়তন বৃদ্ধি হতে থাকল এবং বিদেশ থেকেও লোহার আকর আমদানী হতে লাগল।

ভারতে মুখ্যতঃ

লৌহ ইস্পাত কারখানাগুলো, শস্তা শ্রমিক, পরিবহন ও বাজারের সুবিধে থাকা স্থানে গড়ে উঠেছে। ভিলাই, দুর্গাপুর, জামশেদপুর, বার্ণপুর, রাউরকেল্লা, বোকারোর মতো বড় বড় কারখানা চারটি রাজ্য যথা পশ্চিমবঙ্গ, ঝাড়খন্ড ওড়িশা ও ছত্তিশগড়ে অবস্থিত। স্থানীয় সম্পদের ওপরে নির্ভর করে কর্ণাটকের ভদ্রাবতী, ও বিজয় নগরম, অন্ধ্রের বিশাখা পত্তনম্ ও তামিলনাড়ুর সালেমে গুরুত্বপূর্ণ কেন্দ্র গড়ে উঠেছে। ভারতের ইস্পাত উৎপাদন ১৯৪৭ সালে মাত্র এক নিযুত টন ছিল। কিন্তু বর্ত্তমানে বহুগুন বৃদ্ধি লাভ করেছে।

টাটা ইস্পাত কারখানা জামশেদপুর ঃ ১৯৪৭ সালের আগে ভারতে মাত্র একটাই ইস্পাত কারখানা টাটা ইস্পাত কারখানা ছিল। স্বাধীনতার পরে সরকারী উদ্যোগে অনেকগুলি ইস্পাত কারখানা প্রতিষ্ঠা করা হলো। ১৯০৭ সালে সুবর্ণ রেখা ও খরখাই নদীর সঙ্গম স্থলে, সাকচি নামক জায়গায় টাটা ইস্পাত গড়ে উঠল। পরে শিল্পপতি জামশেদ জীর নামে জায়গার নাম জামশেদপুর হোলো। ভৌগোলিক অবস্থানের ভিত্তিতে জামশেদপুর দেশের সব চেয়ে সুবিধাজনক অবস্থানে থাকা কারখানা। (জামশেদপুর ঝাড়খন্ড রাজ্যের সিংভূম জেলায় অবস্থিত)।

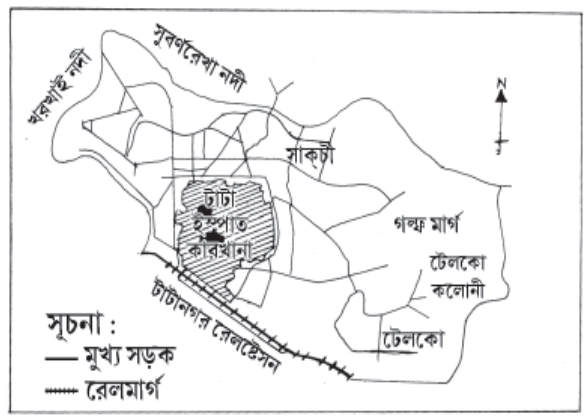

জামশেদপুরের ইস্পাত কারখানা

অনেক কারণে সাকচিতে ইস্পাত কারখানা বসানো স্থির করা হলো। এই কারখানা সেই সময় বেঙ্গল নাগপুর রেলওয়ে বা বর্ত্তমানের মুম্বাই হাওড়া রেলপথের কালিমাটি স্টেশন থেকে মাত্র ৩২ কিমি. দূরে ছিল। এই জায়গার নিকট অঞ্চলে লোহা পাথর, ম্যাঙ্গানীজ, কয়লা গচ্ছিত থাকা এবং কাছেই কোলকাতা মহানগরীর বিশাল বাজারের সুবিধা পাওয়া গেল। এই কারখানা, ঝড়িয়া থেকে কয়লা, ওড়িশা ও ছত্তিশগড় থেকে ম্যাঙ্গানিজ, লোহা পাথর, চুনা পাথর ডোলোমাইট্ আমদানী করে।

খরখাই ও সুবর্ণরেখার অসীম জলরাশি কারখানায় জোগান দেওয়া হলো। টাটা ইস্পাত কারখানার নিজস্ব বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্রও আছে।

পরবর্ত্তীকালে কারখানার বিকাশ ও সম্প্রসারণের জন্য সরকার এগিয়ে এলো এবং যথেষ্ট বিনিয়োগ করা হলো। এই কারখানার ওপরে নির্ভর করে আসেপাশে প্রচুর সহায়ক ছোট ছোট শিল্প গড়ে উঠলো। তারা, ছোটোখাটো গাড়ীর যন্ত্রাংশ, কৃষির যন্ত্রাংশ, লোহার চাদর, তার, বিভিন্ন রাসায়নিক দ্রব্য, রেলের কিছু যন্ত্রাংশ ইত্যাদি উৎপাদন করে।

লৌহ ইস্পাত কারখানার বিকাশ ভারতে দ্রুত শিল্প বিকাশের দরজা উন্মুক্ত করেছিল। আমাদের দেশের প্রায় প্রত্যেক শিল্পানুষ্ঠান তাঁদের প্রাথমিকতার জন্য ইস্পাত শিল্পের ওপর নির্ভর করে। ভারতের ইস্পাত শিল্পে বৃহৎ এবং ক্ষুদ্র উভয় উদ্যোগ নিয়ে গঠিত। এর সঙ্গে দ্বিতীয়ক সংস্থা, যেমন রোলিং মিল ও আনুষাঙ্গিক শিল্প সংপৃক্ত।

তোমার কাজঃ ভারতের মানচিত্রে টিস্কোর কাঁচামাল পাওয়ার স্থানগুলির অবস্থান দেখাও।

পিটস্ বার্গ ইস্পাত কারখানা ঃ আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের এক গুরুত্বপূর্ণ ইস্পাত নগরী। এর অবস্থিতি ইস্পাত শিল্পের জন্য অনুকুল পরিস্থিতি সৃষ্টি করেছে। এই স্থানে কয়লা এবং কয়েকটি কাঁচা মাল স্থানীয় ভাবে পাওয়া যায়। কিন্তু এখান থেকে ১৫০০ কিলোমিটার দূরে মিনেসোটা থেকে লোহার আকর আসে। এই আকর (পাথর) খনি থেকে পিটার্সবার্গ পর্য্যন্ত হ্রদ জলপথে সব থেকে শস্তা পরিবহণের দ্বারা পরিবাহিত হয়। এখান থেকে ট্রেনে করে পিটসবার্গে আসে। (The Great lakes water way) ওহিও, মনোগাহেনা এবং আলেঘেনি নদী থেকে প্রচুর জল পাওয়া যায়।

তুমি জানো কি?
'বৃহৎ হ্রদ' পাঁচটি হ্রদ নিয়ে গঠিত যেমন - সুপিরিয়র, হিউরন, ওস্টারিও, মিশিগান ও ইরি। সুপিরিয়ার হ্রদ সর্ববৃহৎ।

বর্ত্তমানে পিটসবার্গে কম সংখ্যক বড় ইস্পাত প্রবন্ধ আছে। এগুলো পিটস্ বার্গের উত্তর দিকে মনো গাহেস ও আলেঘেনি নদীর উপত্যকায় এবং দক্ষিণে ওহিওর তীরে নিম্নাঞ্চলে অবস্থিত। এখানে উৎপাদিত ইস্পাত জলপথে এবং স্থলপথে বাজারে আসে পিটস্বার্গে ইস্পাত ছাড়াও অন্যান্য বহু কলকারখানা আছে। এরা ইস্পাত দিয়ে বিভিন্ন প্রকার জিনিষ তৈরী করে। তার মধ্যে পরিবহনের সরঞ্জাম, ভারী যন্ত্রপাতি ও রেলের লাইন ইত্যাদি।

বয়ন শিল্প ঃ সুতো থেকে কাপড় বোনা এক প্রাচীন কলা। তুলো, রেশম, পশম ও পাটের তন্তু দিয়ে বস্ত্র বোনা হয়। তাই বয়ন শিল্পকে কাঁচা মালের নিরীখে বিভিন্ন শ্রেণীতে ভাগ করা যেতে পারে। বয়ন শিল্পে বিভিন্ন তন্তুই কাঁচামাল হিসেবে ব্যবহার হয়। এই তন্তু প্রাকৃতিক ও কৃত্রিম দুরকমের হয়। তুলো, পশম, রেশম, পাট, লিনেন প্রভৃতি প্রাকৃতিক। কৃত্রিম হলো, নাইলন, বেয়ন, পলিয়েস্টার প্রভৃতি।

কার্পাস শিল্প ও বয়ন কর্ম পৃথিবীর অতি প্রাচীন শিল্প। অষ্টাদশ শতাব্দীর আগে হাতে কাটা সুতো ও হস্ততন্ত দ্বারা কাপড় বোনা হতো। অষ্টাদশ শতাব্দীতে কলের তাঁত উদ্ভাবন হওয়ার পর বয়ন শিল্পের সর্বাঙ্গীন বিকাশ শুরু হোলো। প্রথমে ইংল্যান্ডে ও পরে সারা পৃথিবীতে কলের তাঁত প্রচলিত হলো।

বর্ত্তমানে ভারত, চীন, জাপান ও আমেরিকা কার্পাস বস্ত্র উৎপাদনে বিশ্বের অগ্রণী দেশ।

উন্নতমানের সূতী বস্ত্রর জন্য ভারতবর্ষ পুরাতন কাল থেকেই বিখ্যাত। ভারতের গৌরবময় ইতিহাসে - ঢাকাই মসলিন, মসলিপট্টেনম চিনজেন, কালিকটের কালিকো, বঙ্গের জামদানী, সুরাট ও ভদোদরার সোনার কাজ করা বস্ত্র ও বেনারসী শাড়ীর কারুকার্য্য প্রাচীন ও বিখ্যাত। কিন্তু হাতে বোনা কাপড় সময় ও ব্যায় বহুল। তাই শীঘ্রই এবং কম খরচে বোনা কলের তাঁতের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে পারম্পরিক বয়ন শিল্প প্রতিযোগিতায় সফল হতে পারলোনা। ১৮৫৪ সালে মুম্বাইতে প্রথম কলের তাঁত শিল্প প্রতিষ্ঠিত হলো।

এখানকার উষ্ণ আদ্র জলবায়ু যন্ত্রপাতি আমদানীর জন্যে বন্দরের সুবিধা, কাঁচামালের সুলভতা ও দক্ষ শ্রমিক পাওয়ায় শিল্পের উন্নতি ঘটল।

প্রারম্ভে জলবায়ু ও কৃষ্ণ কার্পাস মৃত্তিকার জন্যে মহারাস্ট্র ও গুজরাতে প্রচুর তুলো উৎপাদন ও পরিবহনের সুবিধার জন্যে অনেক শিল্প গড়ে উঠল। এখন কৃত্তিম উপায়ে আদ্র শুষ্ক জলবায়ুর সৃষ্টি করতে পারার ফলে, অন্যান্য অঞ্চলেও বয়ন শিল্প বিশেষ ভাবে গড়ে উঠেছে। এভাবে তুলোর ওজন হ্রাস না হয়ে কাপড় বোনা ঠিক হয়। বর্ত্তমানে, ভারতের বিভিন্ন প্রান্তে যথাঃ কোয়েম্বাটুর, কানপুর, কোলকাতা, চেন্নাই, লুধিয়ানা, পানিপথ, আহমেদাবাদ প্রভৃতি স্থানে বিশেষ ভাবে বয়ন শিল্প গড়ে উঠেছে।

আহমেদাবাদ ঃ গুজরাটের সাবরমতী নদীর তীরে অবস্থিত। ১৮৫৯ সালে এখানে প্রথম বয়ন শিল্প প্রতিষ্ঠা হয়েছিল। খুব কমসময়ে ভারতের দ্বিতীয় প্রমুখ বয়ন শিল্পে পরিণত হলো। আহমেদাবাদকে ভারতের ম্যানচেষ্টার আখ্যা দেওয়া হয় এখানকার অনুকূল ভৌগোলিক পরিস্থিতি এই শিল্পের বিকাশের প্রধান সহায়ক। এই স্থানের চারিদিকে প্রচুর তুলোচাষ হয় এবং আদ্র জলবায়ুর জন্য সুতো কাটা ও কাপড় বোনা খুব সুবিধা এই অঞ্চলের সমতল ভূমিতে কলকারখানা স্থাপন করা সুবিধেজনক। মহারাস্ট্র ও গুজরাট ঘন বসতি অঞ্চল হওয়ায় এখানে দক্ষ ও অর্ধ্যদক্ষ শ্রমিকের অভাব হয় না। উন্নত সড়ক ও বেলপথের সুব্যবস্থা থাকায় দেশের বিভিন্ন প্রান্তে বস্ত্র দ্রব্য পাঠানো খুব সুবিধাজনক হতে পেরেছে। ফলে বাজার ব্যবস্থা সুলভ হয়েছে এবং মুম্বাই বন্দর নিকটে থাকায় যন্ত্রপাতি আমদানি ও বস্ত্র রপ্তানীর প্রচুর সুবিধা পাওয়া যায়। তোমার কাজ আহমেদাবাদে প্রচুর তুলো পাওয়া যাওয়ার কারণ কি?

তোমার কাজ ঃ
কোনো দর্জীর দোকান থেকে বিভিন্ন টুকরো কাপড় যোগাড় করে সূতী, রেশম, পশম, নাইলন প্রভৃতি শ্রেণী বিভক্ত কর ও কাঁচা মালের নাম লেখ।

তুমি জানো কি? ভারতের বয়ন শিল্পে উৎপাদিত সামগ্রীর প্রায় এক তৃতীয়াংশ বিদেশে রপ্তানী হয়।

ম্যানচেষ্টার ঃ ইংল্যান্ডের এই স্থানে প্রথম বৃহৎ বয়ন শিল্প প্রতিষ্ঠা করা হয়েছিল। ভারত থেকে তুলো, পাট, রেশম প্রভৃতি আমদানী করা হতো।

ওসাকা ঃ জাপানের প্রমুখ বয়ন শিল্প কেন্দ্র। একে জাপানের মানচেষ্টার বলা হয়। অনেক ভৌগোলিক কারণে এখানে বয়ন শিল্প গড়ে উঠেছে। এর চারিদিকে সুবিস্তৃত সমতল অঞ্চল ও উষ্ণ আদ্র জলবায়ু সুতো কাটা ও কাপড় বোনার জন্যে বেশ সহায়ক। নিকটের ওড়ো নদীর থেকে প্রচুর জলের যোগান পাওয়া যায়। প্রচুর দক্ষ শ্রমিক ও বন্দরের সুবিধে থাকায় তুলো আমদানি করে বোনা বস্ত্র রপ্তানী করা সুবিধে জনক হয়েছে। ওসাকা কাঁচা মালের জন্য ভারত, চীন, আমেরিকা ও ইজিপ্ট থেকে তুলো আমদানি করে। এখানকার বস্ত্র উন্নত মানের এবং শস্তা হওয়ায় বাজারে ভালো চাহিদা আছে। দেশের গুরুত্বপূর্ণ বয়ন শিল্প কেন্দ্র হলেও বর্ত্তমানে এখানে ইস্পাত, জাহাজ, যন্ত্রপাতি, মটর গাড়ি ও বৈদ্যুতিক সরঞ্জাম শিল্প গড়ে উঠেছে।

তোমার কাজ ঃ কোনো দর্জীর দোকান থেকে বিভিন্ন টুকরো কাপড় যোগাড় করে সূতী, রেশম পশম নাইলন প্রভৃতি শ্রেণী বিভক্তকর ও কাঁচা মালের নাম লেখ।

সূচনা প্রযুক্তি বিদ্যা ঃ সাধারণত একটি কার্য্য দিবস আট ঘন্টা হয়। যদি ২৪ ঘন্টা কার্য্য দিবস হয় তাহলে কত কাজ সম্পন্ন হতে পারবে ভাবো। আমেরিকা ও বেঙ্গালুরু এটাকে বাস্তব করার জন্যে জোট বেঁধেছে কিছু সফ্‌টওয়ার কোম্পানী বিভিন্ন উপায়ে এই কাজ আরম্ভ করেছে। যেমন আমেরিকার ড্যানি ও বেঙ্গালুরুর স্মিতা মিলিত ভাবে এই প্রকল্পে কাজ করছে। স্মিতা যখন শোয় তখন ড্যানি কাজ করতে থাকে। আবার ড্যানির কার্য্য নির্ঘন্ট দিবস সমাপ্ত হওয়ার সময় স্মিতার জন্যে তার কাজের অগ্রগতির বার্ত্তা ইন্টরনেটে দিয়ে দেয়।

স্মিতা কিছুক্ষণ পরে কাজে যোগ দেওয়ার সময় কাজের গতি দেখে সিধে কাজে লেগেযায়। এইভাবে স্মিতা ও সারাদিন কাজ করে তার অগ্রগতি জানিয়ে দেয়। এরা দুজন পরস্পরের সঙ্গে যোগাযোগ রেখে এমন ভাবে কাজ করছে যেন পাশাপাশি অফিসে রয়েছে।

সূচনা প্রযুক্তি বিদ্যা ঃ সূচনা সংরক্ষণ প্রক্রিয়াকরণ ও প্রসারণ সহ সম্পৃক্ত প্রযুক্তি বিদ্যার অগ্রগতি রাজনৈতিক ও সামাজিক পর্য্যায় ক্রমিক পরিবর্ত্তন হেতু সম্ভব হয়েছে। সম্পদের আহরণ ব্যায়ের পরিমাণ, প্রাধান সংরচনা প্রভৃতি কারণ এই শিল্পকে প্রভাবিত করে থাকে।

এই শিল্পের মুখ্যঃ কেন্দ্রগুলির মধ্যে ক্যালিফোর্নিয়ার সিলিকন ভ্যালি ও ভারতের বেঙ্গালুরু বিখ্যাত।

তোমার জন্য কাজ ঃ

বেঙ্গালুরুতে অনেক সরকারী সংস্থা ও গবেষণাগার আছে। নিম্নোক্ত কয়েকটি সংস্থার পুরো নাম লেখ।

সূচনা প্রযুক্তি বিদ্যা শিল্পকেন্দ্র।

দাক্ষিণাত্য মালভূমিতে অবস্থিত বেঙ্গালুরুকে সিলিকন শহর বলা হয়। এই শহরে সারা বছরই মৃদু জলবায়ু অনুভুত হয়। সিলিকন উপত্যকা আমেরিকার রকি পর্বতের শান্তা ক্লায়া উপত্যকার অংশ বিশেষ। নাতিশীতোষ্ণ আবহাওয়ার জন্য এই স্থানের তাপমাত্রা কখনোও হিমাংকের নীচে নামে না। এই উপত্যকা ও বেঙ্গালুরু মধ্যে বহুলাংশে সমানতা ও সুবিধা থাকার কারণগুলি বোঝা যাবে যথাঃ

তুমি জানো কি ?

উক্ত প্রযুক্তি বিজ্ঞান সম্বন্ধিত শিল্প কেন এক জায়গায় গড়ে ওঠে ?

১। প্রধান রাস্তা বা রাজপথের পার্শ্বে গড়ে ওঠে যাতায়াতের সুবিধার জন্য।

২। শিল্প সংস্থার মধ্যে জ্ঞান কৌশল বিনিময়ের দ্বারা প্রত্যেকে লাভবান হয়।

৩। রাস্তা ঃ গাড়ি পার্কিং এর স্থান পাওয়া এবং আবর্জনা নিষ্কাসন সহজে হয়।

তুমি জানো কি ?

আমেরিকার অনেক শিল্পে সংস্থা নিজের কাজের জন্যে ভারতীয় দক্ষ সূচনা প্রযুক্তি বিদ্যা সম্পন্ন মানব সম্পদের ওপর নির্ভর করে। তাই এরা নিজের দেশের কর্মীদের কাজে না লাগিয়ে সস্তা ও সমান দক্ষ ভারতীয়দের নিযুক্ত করছে। তাই ওরা পরস্পরকে হচ্ছেন বলে বলেন।

প্রযুক্তি বিদ্যা শিল্পের দৃষ্টিতে বেঙ্গালুরুর বিশেষত্ব ঃ এখানে সর্বাধিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও সূচনা প্রযুক্তি প্রদান করার শিক্ষা কেন্দ্র আছে। শহরটিতে নাতিশীতোষ্ণ আবহাওয়া, পরিচ্ছন্নতা ও আর্থিক উপার্জনশীলতা সম্ভব হয়।

১৯৯২ সালে কর্নাটক রাজ্য সরকার সর্বপ্রথমে সূচনা ও প্রযুক্তি বিদ্যা আইন প্রণয়ন করেছিল।

এই শহরে যোগ্যতা সম্পন্ন কর্মকুশলী মানব সম্পদের আধিক্য আছে।

বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিদ্যার ক্ষেত্রে বিশ্ব স্তরীয় কেন্দ্রের সঙ্গে বেঙ্গালুরুর সুদৃঢ় সম্পর্ক রয়েছে।

তোমার কাজ ঃ বেঙ্গালুরুতে অবস্থিত সূচনা প্রযুক্তি বিদ্যা সম্বন্ধিয় কোম্পনীদের মধ্যে ইনফোসিস্ ও উইপ্রো প্রধান। অন্যান্য দেশীয় কোম্পানীদের নাম জানো ও লেখ।

সিলিকন উপত্যকার বিশেষত্বঃ

নাতিশীতোষ্ণ জলবায়ু, সুনির্মল পরিবেশ ও ভবিষ্যতে বিকাশের জন্য পর্য্যাপ্ত মাত্রায় ভূসম্পদের প্রাপ্যতা। উন্নত সড়ক, রেলপথ ও আন্তর্জাতিক, বিমানবন্দরের দ্বারা অন্য স্থানের সঙ্গে সংযোগ।

বেচাকেনার বাজার ও দক্ষ শ্রমিক সহজলভ্যতা।

ভারতের কয়েকটি প্রধান নগরে যথা ঃ মুম্বাই, দিল্লী, হায়দ্রাবাদ ও চেন্নাইয়ে তেও প্রযুক্তি বিদ্যার নতুন কেন্দ্র প্রতিষ্ঠা হয়েছে। এছাড়া অন্যান্য যেমন গুরগাওঁ, পুনে, চন্ডীগড় তিরুবন্তপুরম, কোচি ও ভুবনেশ্বর শহরে ও প্রতিষ্ঠা হয়েছে। তবে বেঙ্গালুরু শীর্ষস্তরীয় পরিচালনা ও মানব সম্পদের জন্য এখনও নিজের আধিপত্য বজায় রখেছে।

প্রশ্নমালা

১। **নিম্নলিখিত প্রশ্নের উত্তর লেখ।**

ক) শিল্প বলতে কি বোঝায়?

খ) শিল্প প্রতিষ্ঠার জন্য কি কি মুখ্যতঃ প্রয়োজন হয়?

গ) কোন শিল্পকে আধুনিক শিল্পের মেরুদন্ড বলা হয় এবং কেন?

ঘ) কার্পাস বয়ন শিল্প মুম্বাইয়ে প্রতিষ্ঠা এবং সমৃদ্ধ হওয়ার কারণ কি?

ঙ) বেঙ্গালুরু এবং সিলিকন ভ্যালির মধ্যে সূচনা প্রযুক্তি বিদ্যার ক্ষেত্রে কিকি সামঞ্জস্য দেখা যায়?

২। নীচের প্রশ্নগুলির উত্তর লেখ।

ক) ভারতের প্রধান ইস্পাত কারখানাগুলির নাম এবং কোন কোন রাজ্যে অবস্থিত লেখ।

খ) কাঁচা মালের ওপরে আধারিত চারটি শিল্পের নাম উদাহরণ দিয়ে লেখ।

গ) দেশের জন্যে শিল্পের বিকাশ কেন মহত্বপূর্ণ? দুটো কারণ দেখাও।

ঘ) ভারতের ৪টি শিল্পাঞ্চলের নাম লেখ।

ঙ) বেঙ্গালুরু শহর সূচনা প্রযুক্তি ক্ষেত্রে প্রগতি করার বিভিন্ন কারণগুলি উল্লেখ কর।

৩। সিলিকন উপত্যকা কোথায়?

ক) বেঙ্গালুরু খ) হায়দ্রাবাদ

গ) আহমেদাবাদ ঘ) ক্যালিফোর্নিয়া

৪। কোনটা প্রাকৃতিক তন্তু?

ক) নাইলন খ) টেরিলিন

গ) ডেক্রন ঘ) পাট।

৩। কোন শিল্পের সর্বশেষে উৎপাদন অন্য শিল্পে কাঁচামাল হিসেবে ব্যাবহৃত হয়?

ক) মৌলিক খ) বৃহৎ

গ) উপভোক্তা ঘ) ক্ষুদ্র

৪। এক স্থানে অনেক শিল্প প্রতিষ্ঠা হলে কি গড়ে ওঠে?

ক) শিল্পায়ন খ) শিল্পাঞ্চল

গ) শিল্পকেন্দ্র ঘ) শিল্প সংস্থা

৪। পার্থক্য দেখাও।

ক) সরকারী সংস্থা ও মিলিত সংস্থা

খ) আধারিক সংরচনা ও প্রক্রিয়াকরণ

(গ) নিবেশ ও উৎপাদ

৫। প্রত্যেকের দুটি করে উদাহরন দাও ঃ

(ক) কাঁচামাল:-------- এবং ---------- ।

(খ) উৎপাদ: -------- এবং --------।

(গ) কুটীরশিল্প: -------- এবং --------।

(ঘ) সমবায় সংস্থা: ---------এবং --------।

(ঙ) সেবাক্ষেত্র: -------- এবং --------।

তোমার কাজ ঃ (প্রকল্প)

১। ভারতের মানচিত্রে দেশের প্রধান শিল্পাঞ্চলগুলি রং করে দেখাও।

২। খবরের কাগজে দেওয়া বিজ্ঞাপন থেকে বিভিন্ন উৎপাদন সংগ্রহ করো এবং সেগুলো তোমার পড়া বিভিন্ন প্রকার শিল্পে বিভক্ত কর।

৩। নীচের সারণীতে তোমার পড়া বিভিন্ন প্রকার শিল্প সম্বন্ধে সূচনা দাও।

শিল্পের নাম	পৃথিবীর মুখ্যদেশ	ভারতে অবস্থিত কেন্দ্র

পঞ্চম অধ্যায়

মানব সম্পদ

মানুষ দেশের সর্বশ্রেষ্ঠ সম্পদ বলে আমরা পড়েছি। লোকেরা তাদের প্রয়োজন ও সামর্থ্যের ভিত্তিতে প্রাকৃতিক পদার্থকে সম্পদে পরিণত করে। সুতরাং মানব সম্পদই প্রাথমিক সম্পদ। শিক্ষিত, স্বাস্থ্যবান ও উদ্যোগী মানব নিজের প্রয়োজন অনুসারে সম্পদের বিকাশ ঘটায়।

অন্যান্য সম্পদের মতো পৃথিবীতে মানব সম্পদের বিতরণে অসামঞ্জস্য দেখা যায়। তাদের মধ্যে শিক্ষাগত যোগ্যতা বয়স ও লিঙ্গভেদ পার্থক্য থাকে। জনসংখ্যা তথা লোকের গুনাগুনও সর্বদা পরিবর্ত্তনশীল।

তুমি জানো কি?
ভারত সরকারের মানব সম্পদ বিকাশ নামে এক স্বতন্ত্র মন্ত্রণালয় আছে। লোকের কার্য্য কুশলতা বৃদ্ধির লক্ষে ১৯৮৫ সালে এই মন্ত্রালয় সৃষ্টি করা হয়েছে। এতেই বোঝা যায় যে দেশের মানব কত গুরুত্ব পূর্ণ সম্পদ।

জনসংখ্যার বিতরণ ঃ লোকেরা সারা পৃথিবীতে যে ভাবে ছড়িয়ে ছিটিয়ে অবস্থান করছে, তাকে জনসংখ্যা বিতরণ বলা হয়। তোমরা জেনে আশ্চর্য্য হয়ে যাবে যে মাত্র ১০ শতাংশ ভাগ স্থলভাগের ওপর সমগ্র জনসংখ্যার প্রায় ১০ ভাগ লোক বসবাস করে। এ থেকে জনসংখ্যা বিতরণের অত্যাধিক অসমানতা সহজেই বোঝা যায়। আবার কোনো কোনো অঞ্চলে খুব কম লোক বাস করে।

দক্ষিণ ও দক্ষিণপূর্ব এশিয়া, ইউরোপ, উত্তর আমেরিকার উত্তর পূর্বাংশ জনবহুল অঞ্চল বলে পরিচিত। উচ্চ অক্ষাংশ অঞ্চল, ক্রান্তীয় মরুভূমি, উচ্চ পার্বত্য ভূমি ও বিষুব মণ্ডলীয় অরণ্যাঞ্চলে খুব কম লোকে বসবাস করে।

দক্ষিণ গোলার্ধের তুলনায় উত্তর গোলার্দ্ধ জলবহুল এলাকা, সমগ্র জনসংখ্যার শতকরা প্রায় ৭৫ ভাগ লোক কেবল এশিয়া ও আফ্রিকায় বসবাস করে। পৃথিবীর মোট জনসংখ্যার শতকরা ৬০ ভাগ লোকে মাত্র ১০টি দেশে রয়েছে। এদের মধ্যে প্রত্যেক দেশের জনসংখ্যা প্রায় ৪০ কোটির কাছাকাছি।

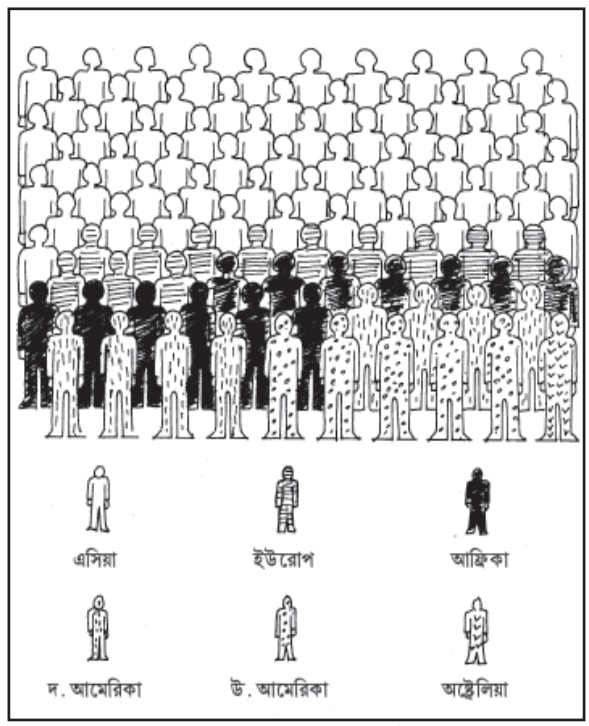

চিত্র - ৫.১
বিভিন্ন মহাদেশের জনসংখ্যা

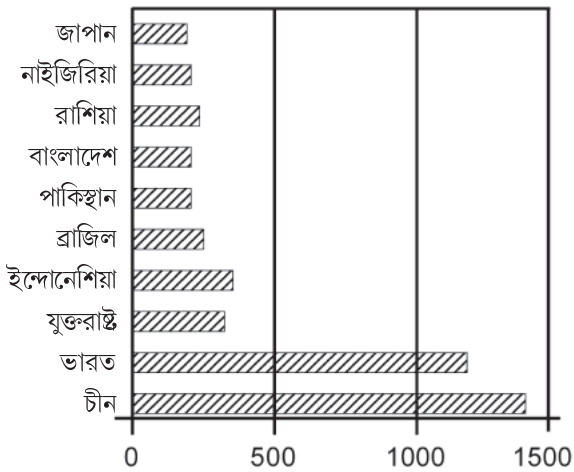

চিত্র - ৫.২

পৃথিবীর অধিক জনসংখ্যা বিশিষ্ট দেশ

তোমার কাজ ঃ চিত্র ৫.১ অনুধ্যান কর ও বের করো। কোন মহাদেশে পৃথিবীর মোট জনসংখ্যার।

ক) কেবল ৫ ভাগ লোক বাস করে।

খ) কেবল ১৩ ভাগ লোক বাস করে।

গ) কেবল ১ ভাগ লোক বাস করে

ঘ) কেবল ১২ ভাগ লোক বাস করে।

তুমি জানো কি?

ভারতে জনসংখ্যার হারাহারি ঘনত্ব প্রতি বর্গকিলোমিটারে ৩২৪ জন

তোমার কাজ ঃ চিত্র নং ৫.২ দেখ এতে উল্লিখিত দেশের মধ্যে কোন কোন দেশ এশিয়ার অন্তর্গত?

এশিয়ার মানচিত্র সংগ্রহ করে বিভিন্ন রং দিয়ে দেখাও।

জনসংখ্যার ঘনত্ব ঃ কোনো নির্দিষ্ট একক পরিমিত অঞ্চলে বাস করতে থাকা লোকের সংখ্যাকে জনসংখ্যার ঘনত্ব বলা হয়। সাধারণতঃ এটা বর্গকিলোমিটার পিছু হিসেব করা হয়। সারা পৃথিবীর জনসংখ্যা প্রতি বর্গকিলো মিটারে ৪৫ জন। দক্ষিণ কেন্দ্রীয় এশিয়া সর্ব্বোচ্চ ঘনত্ব বিশিষ্ট অঞ্চল। এর পর পূর্ব ও দক্ষিণপূর্ব এশিয়া অঞ্চল রয়েছে।

আমাদের শ্রেণী কক্ষে সমস্ত ৪০ জন ছাত্র উপস্থিত থাকলে শ্রেণী কক্ষ ভর্ত্তি লাগে। কিন্তু হলঘরে বসলে ফাঁকা ফাঁকা লাগে, কেন?

কারণ হলের আকার শ্রেণী কক্ষের চেয়ে অনেক বড়। তবে স্কুলের সব ছাত্র হলে উপস্থিত হলে দেখতে ভাল লাগে।

জনসংখ্যার ঘনত্বকে প্রভাবিত করার কারণঃ ভৌগোলিক কারণ ঃ

ভূমিরূপ ঃ লোকেরা পাহাড়িয়া ও নিম্ন স্যাঁতসেতে জায়গার চেয়ে সমতল অঞ্চলে বাস করতে ভালোবাসে।

কারণ এখানে কৃষি, শিল্প, অন্যান্য পরিসেবার কার্য্য যথেষ্ট অনুকূল। সেই জন্য গাঙ্গেয় সমতল অঞ্চল পৃথিবীর অতি ঘনজনবসতিপূর্ণ অঞ্চল। তাই, হিমালয়, আন্ডিজ ও আল্পস উচ্চপার্বত্য অঞ্চল জন বিরল। আমাদের রাজ্যের উপকূলবর্তী সমতল অঞ্চলের জল ঘনত্ব কেন্দ্রীয় পার্বত্যাঞ্চলের তুলনায় যথেষ্ট বেশী।

জলবায়ু ঃ চরম জলবায়ু বিশিষ্ট অঞ্চলে মানুষ বসবাস করতে চায় না। এই অতি উষ্ণ বা শীতল, শুষ্ক ও বৃষ্টিবহুল অঞ্চলে খুব কম লোকে বাস করে বা আদৌ করে না যেমন ঃ দুই মেরু অঞ্চল, মরুভূমি, ঘন অরণ্য প্রভৃতি জনবিরল বা জনশূণ্য স্থান।

মৃত্তিকা ঃ উর্বর মৃত্তিকা কৃষির পক্ষে খুবই উপকারী। ভারতের গঙ্গা ও ব্রহ্মপুত্র, চীনের হোয়াংহো, চাংছিয়াং এবং মিশরের নীলনদের উর্বর পলিযুক্ত সমতলাঞ্চলে ঘন জনবসতি দেখা যায়। এই রাজ্যের কোন নদী উপত্যকায় ঘন জনবসতি দেখতে পাওয়া যায়?

জল ঃ সহজে পরিষ্কার মিষ্টি জল পাওয়া অঞ্চলে লোকেরা বসবাস করতে পছন্দ করে। তাই নদী উপত্যকায় ঘন জনবসতি দেখা যায়।

মধুর জলের উৎকট অভাবের জন্য মরুভূমি জন বিরল।

খণিজ পদার্থ ঃ

খণিজ পদার্থ থাকা স্থানে লোকে বেশী সংখ্যায় বাস করে দক্ষিণ আফ্রিকার হীরের খনি ও মধ্য প্রাচ্যতে পেট্রোলিয়াম আবিষ্কার হওয়ার পরে এসব অঞ্চলে ঘন জনবসতি গড়ে উঠেছে।

সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও আর্থিক কারণ ঃ

উত্তম বাসগৃহ, শিক্ষা ও স্বাস্থ্য ইত্যাদির ব্যবস্থা থাকা অঞ্চলে ঘনজনবসতি গড়ে ওঠে। যেমন ভারতের পুনে শহর ও ভুবনেশ্বরে এই কারণে বেশী লোক বাস করে।

সাংস্কৃতিক ঃ

ধর্ম ও সাংস্কৃতিক গুরুত্ব থাকা স্থানের প্রতি লোকেরা আকর্ষিত হয়। পুরী, বেনারস, কাশী, গয়া, জেরুজালেম, ভাটিক্যানসিটি প্রভৃতি।

আর্থিক ঃ

শিল্পাঞ্চলে বেশী কাজের সুযোগ থাকে। তাই লোকে এই অঞ্চলের প্রতি আকর্ষিত হয় ভারতের মুম্বাই, ওড়িশার রাউরকেল্লা, জাপানের ওসাকা এর ভালো উদাহরণ। জনসংখ্যা পরিবর্ত্তন ঃ কোনো অঞ্চলের সময়ের ব্যবধানে জনসংখ্যার হ্রাস বৃদ্ধিকে জনসংখ্যা পরিবর্ত্তন বলা হয়। পৃথিবীর জনসংখ্যা কখনও স্থির নয়। মানব ইতিহাসের দীর্ঘ সময় ধরে প্রায় ১৮০০ সাল পর্য্যন্ত জনসংখ্যা ধীর গতিতে বৃদ্ধি হচ্ছিল উপযুক্ত স্বাস্থ্য সুবিধা না পাওয়ায় অধিকাংশ শিশুর মৃত্যু হতো। তাছাড়া বিভিন্ন দেশে খাদ্য সমস্যা ও একটা বিরাট কারণ ছিল। আকাল মৃত্যু তখন খুব সাধারণ বিষয় ভাবে পরিচিত ছিল। তার ফলে জনসংখ্যার বৃদ্ধি ধীরগতি ভাবে হতো।

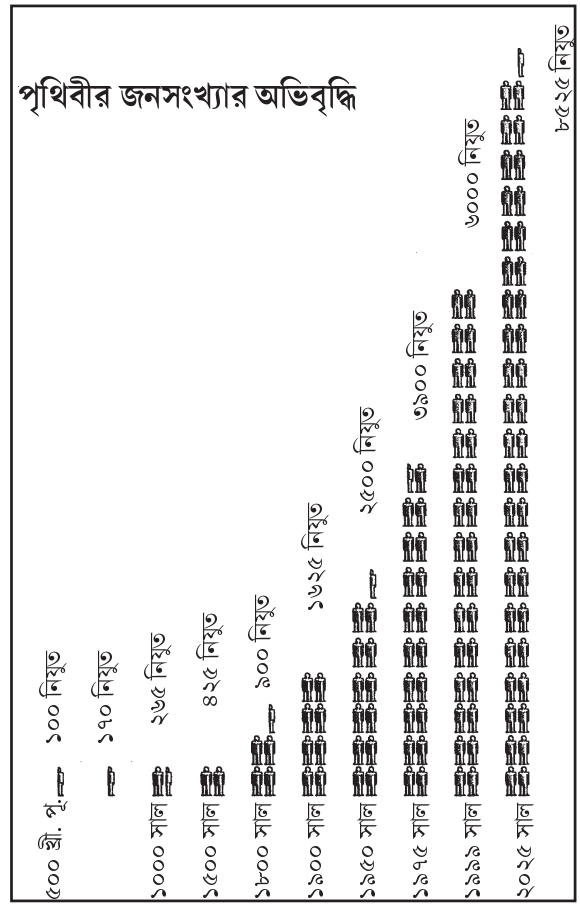

চিত্র - ৫.৩

১৮২০ সালে পৃথিবীর জনসংখ্যা ১০০ কোটিতে পৌঁছল। কিন্তু এর ১৫০ বছর পরে ১৯৭০ সালে জনসংখ্যা ৩০০ কোটি হয়ে গেল। একে জন বিস্ফোরন বলে। মাত্র ৩০ বছর পরে ২০০০ সালের মধ্যেই এই সংখ্যা ৬০০ কোটির হয়ে গেল। যথেষ্ট খাদ্য ও চিকিৎসার সুলভতা হেতু অকাল মৃত্যু, শিশু মৃত্যু ব্যাধি ইত্যাদি হ্রাস পেয়ে মৃত্যুর হার খুব কমে গেল এবং জনসংখ্যা বৃদ্ধি পেল।

জন্ম ও মৃত্যু সংখ্যার পরিমাপক হিসেবে জন্মহার ও মৃত্যু হার ধরা হয়। বার্ষিক প্রতি ১২ হাজার জনসংখ্যায় জন্মিত জীবন্ত শিশুর সংখ্যা হচ্ছে জন্ম হার। সেই ভাবে বার্ষিক প্রতি ১ হাজার জনসংখ্যায় মৃত্যু বরণ করা লোকের সংখ্যা মৃত্যুহার। জন্ম ও মৃত্যু উভয় জনসংখ্যা পরিবর্ত্তনের প্রাকৃতিক কারণ কোনো দেশের জন্ম ও মৃত্যুহারের পার্থক্যকে

প্রাকৃতিক অভিবৃদ্ধি হার বলা হয়। এই অতিবৃদ্ধি হারের আধিক্যই হচ্ছে জনসংখ্যা বৃদ্ধির প্রধান কারণ।

কোনো অঞ্চলের বাইরে বা ভেতরে যাওয়া আসাকে দেশান্তরী বলা হয়। এর ফলেও জনসংখ্যায় পরিবর্তন আসে। লোকেরা দেশের ভেতরে বা বাইরে যেতে পারে। যারা স্বদেশ ছেড়ে অন্য দেশে গিয়ে বাস করে তাদের প্রবাসী বলা হয়। যারা অন্য দেশ থেকে আসা লোককে বিদেশাগত বলা হয়।

মনে রেখো ঃ

বিদেশাগত - যখন কোনো ব্যাক্তি অন্য দেশে প্রবেশ করে।

প্রবাস গমন ঃ কোনো ব্যক্তির স্বদেশ ছেড়ে অন্যত্র চলে যাওয়াকে বোঝায়।

আমেরিকা ও অষ্ট্রেলিয়ায়বাইরের থেকে আসা অর্থাৎ বিদেশাগত লোকের দ্বারা জনসংখ্যা বিশেষ ভাবে বৃদ্ধি হয়েছে। কিন্তু সুদানের মতো দেশের প্রবাস গমনের জন্য সংখ্যা কমেছে।

উত্তম সুযোগের লক্ষে লোকেরা স্থানান্তরিত হয়, জনসংখ্যার পরিবর্ত্তন ধারা ঃ পৃথিবীর বিভিন্ন অঞ্চলের জনবৃদ্ধির পার্থক্য আছে। সারা পৃথিবীর মোট জনসংখ্যা দ্রুত বৃদ্ধি হলেও সর্বদেশে সমান নয়। কেনিয়ার মতো কিছুদেশে দ্রুত জন বৃদ্ধি হচ্ছে, যতেষ্ঠ স্বাস্থসেবার জন্য এই বৃদ্ধি হচ্ছে। জন্মহার পূর্বের মতোই আছে কিন্তু মৃত্যুহার অনেক কমে গেছে। তবে ব্রিটোনর মতো কিছু ইউরোপীয় দেশে জন্মহার ও মৃত্যুহার প্রায় সমান হওয়ার ফলে জনসংখ্যা প্রায় সমান রয়েছে। কিছু কিছু দেশে জন্মহারের অপেক্ষা মৃত্যুহার সামান্য বেশী হওয়ায় জনসংখ্যা হ্রাস পাচ্ছে।

জনসংখ্যা গঠন ঃ কোনো দেশের আর্থিক স্বচ্ছলতার সঙ্গে জন বৃদ্ধির কোনো সম্পর্ক থাকে না। যেমন জাপান ও বাংলাদেশে ঘন জনবসতি রয়েছে তবে বাংলাদেশের তুলনায়

আমি নাতি নাতনীদের গল্প বলি।	আমি সেতু নির্মাণ করি
আমি বিবাহ উৎসবে গান গাই।	আমি আমার ঘরের যত্ন নিই।
আমি কর্কট রোগ উপশম করার ওষুধ ব্যবহার করার জন্যে গবেষণা করছি।	আমি কৃষিকার্য্য করি।
আমি মটরগাড়ি চালাই	আমি জুতো তৈরী করি।

চিন্তা করো - প্রত্যেক মানুষ সমাজের এক প্রছন্ন সম্পদ। মানব সম্পদ হিসেবে সমাজে তোমার কি অবদান রাখবে?

কিন্তু জাপানের আর্থিক বিকাশ যথেষ্ট বেশী। সম্পদ ভাবে মানুষের ভূমিকা বুঝতে হলে আমাদের তাদের গুণাবলীর সম্বন্ধে জানতে হবে। বয়স, লিঙ্গ, শিক্ষাগত যোগ্যতা স্বাস্থ্য অবস্থা, বৃত্তি, তথা আয়ের পরিমাণ প্রচার করলে লোকেদের মধ্যে যথেষ্ট পার্থক্য নজরে পড়ে। তাই লোকের এই সব গুণাগুণ জানার আবশ্যকতা আছে। জনসংখ্যার গঠন বললে সংরচনাকেও বোঝায়।

জনসংখ্যা গঠন থেকে পুরুষ স্ত্রী, সংখ্যা, বয়স শ্রেণী, শিক্ষাগত যোগ্যতা স্বাস্থ্য ব্যবস্থা, বৃত্তির প্রকার ও আয় ইত্যাদি জানা যায়।

জনসংখ্যা পিরামিড বা বয়স লিঙ্গ পিরামিড থেকে কোনো দেশের জনসংখ্যার গঠন সম্পর্কে অধ্যয়ণ করা সহজ।

জনসংখ্যা পিরামিড ঃ সর্বমোট জনসংখ্যা ৫-৯ বছর, ১০ - ১৪ বছর এইরূপ ভিন্ন ভিন্ন শ্রেণীতে বিভক্ত থাকা বোঝা যায়।

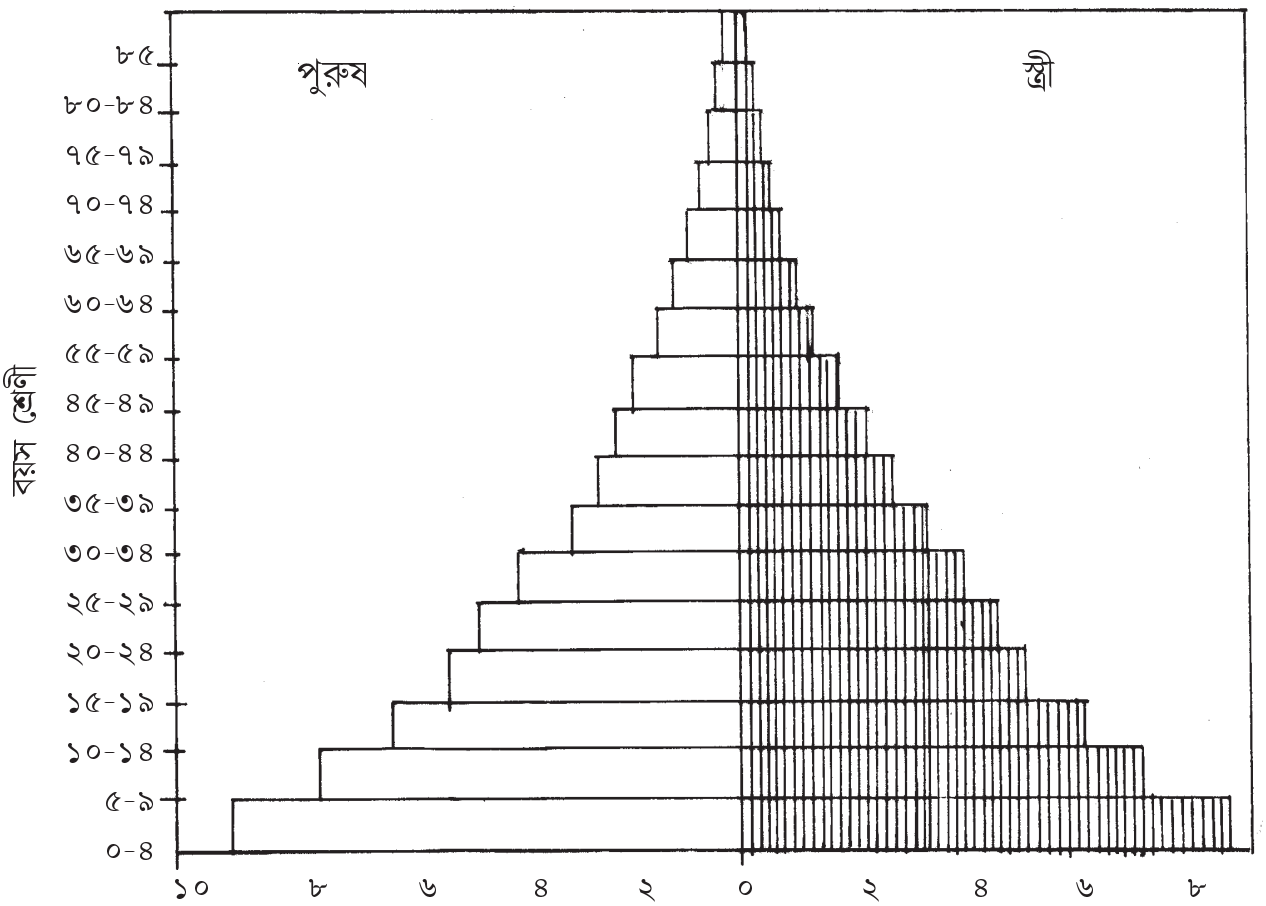

চিত্র - ৫.৪ শতকরা

জনসংখ্যা পিরামিড

প্রত্যেক বয়স শ্রেণীতে পুরুষ ও স্ত্রীর সংখ্যা এবং মোট জনসংখ্যায় এদের শতকরা ভাগ জানতে পারা যায়। জনসংখ্যা পিরামিড আকৃতি থেকে কোনো দেশে বাস করা লোকেদের সম্পর্কে জানা যায়। এই তালিকায় ১৫ বছরের কম বয়সের জন্ম হার প্রতিফলিত হয়। ৬৫ বছরের উর্দ্ধ ব্যাক্তি গনের সংখ্যা সবার ওপরে দেওয়া থাকে। এর থেকে মৃত্যু হারের অনুমান করা যেতে পারে।

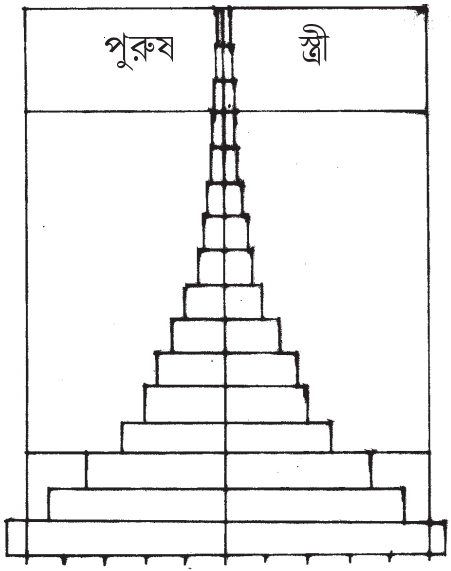

চিত্র ৫.৫ কেনিয়ার জনসংখ্যা পিরামিড

জনসংখ্যা পিরামিড থেকে দেশে নির্ভরশীল জনসংখ্যার তথ্য পাওয়া যায়। নির্ভর শীল জনসংখ্যা দুটি শ্রেণীভুক্ত। নির্ভরশীল কম বয়স (১৫ বছরের কম) ও নির্ভরশীল বয়স্ক লোক (৬৫ বছরের বেশী) । অবশিষ্ট বয়সের লোকেরা কার্য্যক্ষম জনসংখ্যার অন্তর্ভুক্ত।

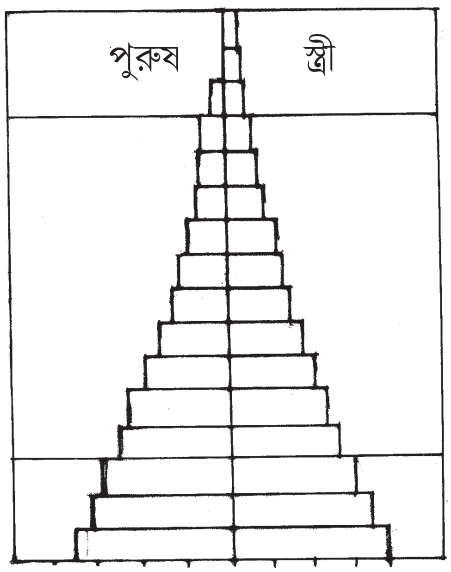

শতকরা চিত্র - ৫.৬

ভারতের জনসংখ্যা পিরামিড

এরা অর্থনিতীর দিক থেকে আত্ম নির্ভরশীল বলে ধরা হয়। কোনো দেশের উভয় জন্ম ও মৃত্যুহার বেশী হলে জনসংখ্যা পিরামিডের নিম্ন অংশ প্রশস্থ এবং ওপরের দিকে দ্রুত সরু হয়ে যায়। এক্ষেত্রে অধিক শিশু জন্ম নিলেও বেশীর ভাগ শৈশবে বা পরে মৃত্যু বরণ করে থাকে। সুতরাং প্রাপ্ত বয়স্কর সংখ্যা কম থাকে। বৃদ্ধ-বৃদ্ধার সংখ্যা আরও কম হয়। কেনিয়া পিরামিডে এ চিত্র ভালো ভাবে বোঝা যায়।

কিছু দেশে শিশু মৃত্যু হার খুব কমে গেছে। তাই সংখ্যা পিরামিড নিচের দিকে চওড়া হয়। বেশী শিশু বেঁচে থাকার মানে প্রাপ্ত বয়স্ক লোক ও বেশী হয়। ভারতের জন পিরামিডে লক্ষণীয়। এর ফলে যুব গোষ্ঠী বেশী থাকার ফলে এক বলিষ্ঠ বিস্তারিত শ্রমিক গোষ্ঠী সৃষ্টি হয়।

জাপানের মতো দেশে জন্ম হার কম থাকায় পিরামিড নীচে সংকীর্ণ হয়।

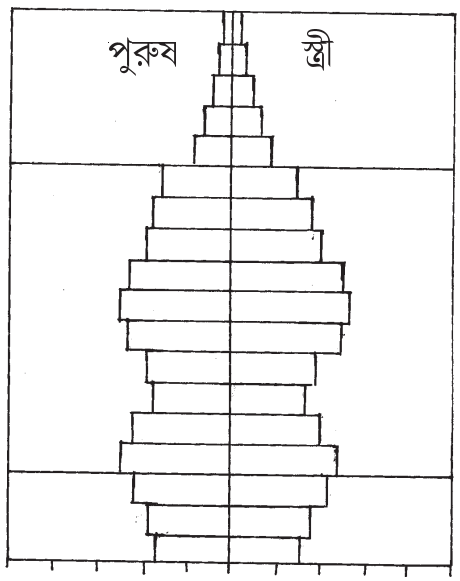

শতকরা চিত্র - ৫.৭

জাপানের জনসংখ্যা পিরামিড

মৃত্যুহার ও কম থাকায় বহুসংখ্যক ব্যক্তি বৃদ্ধাবস্থায় পৌঁছে যান। সাকারত্মক দৃষ্টিভঙ্গি, কার্য্য নৈপুন্য, উৎসাহী ও আশাবাদী যুবগোষ্ঠী যেকোন দেশের ভবিষ্যত।

ভারতে এই সম্পদ প্রচুর থাকায় আমরা যথেষ্ট আশাবাদী ও ভাগ্যবান। এদেরকে সমর্থ ও উৎপাদনক্ষম করতে উপযুক্ত শিক্ষা, কৌশল, বিভিন্ন সুযোগ সুবিধা যুগিয়ে দেওয়া দরকার।

প্রশ্নমালা

১। **নিম্নলিখিত প্রত্যেক প্রশ্নের প্রায় ৪০টি শব্দে উত্তর লেখ।**

ক) মানুষকে কেন সম্পদ বলা হয়?

খ) পৃথিবীতে জনসংখ্যা বিতরণে কেন অসামঞ্জস্য দেখা যায়?

গ) পৃথিবীর জনসংখ্যা দ্রুত কেন বৃদ্ধি পাচ্ছে?

ঘ) জনসংখ্যা পরিবর্ত্তনের যেকোন দুটি কারণ ব্যাখ্যা করো।

ঙ) জনসংখ্যা গঠন বলতে কি বোঝায়?

চ) জনসংখ্যা পিরামিড কি? কোনো দেশের লোকের সম্পর্কে জানতে এটা কি ভাবে সাহায্য করে?

২। **সঠিক উত্তর খুঁজে লেখ।**

১) জনসংখ্যা বিতরণ বলতে কি বোঝায়?

ক) কোনো নির্দ্দিষ্ট অঞ্চলে জন্মানো ব্যাক্তির তুলনায় মৃত্যু বরণ করা লোকের সংখ্যা।

গ) কোনো অঞ্চলে যেভাবে লোকেরা বিভক্ত হয়ে বাস করে।

ঘ) কোনো অঞ্চলে জন্মানো শিশুদের সংখ্যা।

২) জনসংখ্যা পরিবর্তন কোন তিনটি কারণে হয়?

ক) জন্ম, মৃত্যু, বিবাহ

খ) জন্ম, মৃত্যু, দেশান্তর।

গ) জন্ম মৃত্যু মোটামুটি বাঁচার বয়স।

ঘ) জন্ম, বিবাহ, দেশান্তর।

৩) ১৯৯৯ সালে পৃথিবীর জনসংখ্যা কত ছিল?

ক) ১৮০ কোটি খ) ৩০০ কোটি

গ) ৬০০ কোটি ঘ) ৭০০ কোটি

৪) জনসংখ্যা পিরামিড কি?

ক) কোনো জনসংখ্যায় বয়স ও লিঙ্গগত রেখাঙ্কিত চিত্র।

খ) জনসংখ্যা বৃদ্ধি হেতু লোকে বাস করতে থাকা বহুতল বিশিষ্ট বাড়ী।

গ) কোনো জনসংখ্যার বয়স ভিত্তিক রেখাঙ্কিত চিত্র।

ঘ) জনসংখ্যার লিঙ্গগত রেখা চিত্র।

৩। **নিম্নলিখিত শব্দ ব্যবহার করে শূণ্যস্থান পূরণ কর।**

(জলশূন্য, অনুকূল, পতিত জমি, কৃত্রিম উর্ব্বর, প্রাকৃতিক, চরম ঘনত্ব)

কোনো অঞ্চলে অধিক লোক বসবাস করলে জনসংখ্যার — বৃদ্ধি পায়। একে প্রভাবিত করার কারণগুলির মধ্যে জলবায়ু-সম্পদের উপযুক্ত উপলব্ধি ও ভূমি প্রধান।

৪। **তোমার কাজ ঃ**

যদি কোথাও ''১৫ বছরের কম বয়সের বেশী ছেলে থাকে'' এবং অন্য কোথাও ১৫ বছরের খুব কম ছেলে থাকে তবে দুই প্রকার সমাজের বৈশিষ্ট কি হবে?

সূচনা ঃ স্কুলের আবশ্যকতা, পেনশন, যোজনা, শিক্ষক, খেলনা, চাকা লাগানো চেয়ার, শ্রমিকের জোগাড় করা ডাক্তারখানা।

কিছু জানার কথা

ভারত ও ওড়িশার স্থিতি (জনগণনা ২০১১)

		ভারত	ওড়িশা
১।	মোট জনসংখ্যা	১২১০,১৯৩,৪২২	৪১,৯৭৪২,১৮
২।	জনসংখ্যার ঘনত্ব (প্রতি কি.মি. তে)	৩২২	২৬৯
৩।	জনসংখ্যা বৃদ্ধি হার (২০০১ - ২০১১) শতকরা	১৭.৬৪	১৪.০৫
৪।	নারী-পুরুষ অনুপাত (প্রতি ১০০০ পুরুষ-নারী)	৮৪০	৯৭৮
৫।	শহুরে জনসংখ্যা (মোট সংখ্যার শতকরা)	৩১.১৬	১৬.৬৮
৬।	সাক্ষরতা হার (শতকরা)		
	ক) মোট সাক্ষরতা হার	৭৪.০৪	৭২.৮৭
	খ) নারী সাক্ষরতার হার	৬৫.৪৬	৬২.৪৬
	গ) পুরুষ সাক্ষরতার হার	৮২.১৪	৮১.৫৯
৭।	জন্মহার (বার্ষিক) (প্রতি হাজারে)	২০.৯৭	১৯.৮০
৮।	মৃত্যু হার (বার্ষিক) (প্রতি হাজারে)	৭.৪৮	৮.২০
৯।	শিশু মৃত্যু হার (বার্ষিক) (প্রতি লক্ষে জন্মানো)	১৭৮	২৩৭